

Vol. 53 | No. 2 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সাঈদ আহমদের নাট্য নিরীক্ষা : অ্যাবসার্ড রূপকল্প, বাংলার মেটাফর, উদারনৈতিক মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের অন্বয়

Volume	53
Issue	2
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শাহমান মৈশান
Published online	February 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i2.7
Pages	৯১-১১৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সাঈদ আহমদের নাট্য নিরীক্ষা : অ্যাবসার্ড রূপকল্প, বাংলার মেটাফর, উদারনৈতিক মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের অন্বয়

শাহমান মৈশান*

সার-সংক্ষেপ: এই প্রবন্ধে বহুমাত্রিক সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব সাঈদ আহমদের নাট্যসত্তা ও তাঁর নাট্যসম্ভার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তার্কিক (পলিমিক) প্রণালীতে সাঈদ আহমদের নাট্য সংক্রান্ত বিদ্যমান সমালোচনার ক্ষেত্রটিতে বিচরণ করা হয়েছে পূর্ববর্তী সমালোচকদের মতামত প্রশ্নহীনভাবে মেনে নেবার জন্য নয়, বরং বাহাসে জড়িয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে সাঈদ আহমদের নাটকে আত্মস্থ অ্যাবসার্ড রীতির বিশিষ্টতা। অন্যদিকে, এই লেখায় চিহ্নিত করা হয়েছে সাঈদের অ্যাবসার্ড ধারার নাটকে বাংলার মেটাফর কীভাবে তাঁর নাটকে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। আবার এও খোঁজা হয়েছে সাঈদ আহমদের অ্যাবসার্ড ধারার নাটকে অভিযোজিত জাতীয়তাবাদী চেতনা কোন শৈল্পিক ও মানবিক তাড়নায় এক বিশ্বজনীন উদারনৈতিক মানবতাবাদের ছায়াতল সৃষ্টি করতে উন্মুখ হয়েছে।

যদি একটি লেখা সামাজিক, ভাবাদর্শিক ও অজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণসহ নানা শর্তের ফলাফল হয়, তাহলে এই কথনেরও কোনো একক কর্তা নেই। পলিমিক বা তার্কিক উপায়ে বিরাজমান বাহাসের অনেক উপাদানের সাথে বিরোধিতার মাধ্যমে, নাকচ করার ভেতর দিয়ে, আবার সমর্থন ও সংশ্লেষের আঁকশি নিয়ে এই লেখা সাঈদ আহমদের বহুমাত্রিক চর্চার আধার নয়। এমনকি তাঁর সাতরঙা জীবনের মহিমাকীর্তনও নয়, একান্তই তাঁর নাটকের বিশ্লেষণ ও মূল্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে মিশ্র প্রণালীতে রচিত এ লেখা। ডিসকোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এও পরিশেষে এক টুকরা অভিমত মাত্র, যদিও মতামত প্রতিষ্ঠাই এই লেখার লক্ষ্য নয়, বরং অন্য মত বা চিন্তা সৃষ্টিতে অনুঘটকালি করাও এর উদ্দেশ্য হতে পারে। এমনকি, নাট্যকার সাঈদ আহমদকে নিয়ে তর্কে জড়ানোর মাধ্যমে অন্য তর্ক দিয়ে প্রভাবান্বিত ও রূপান্তরিত মতামতের ভেতরে, বসতি স্থাপনের তৎপরতা হিসেবেও এই লেখাকে বিবেচনা করা যেতে পারে। যে লেখায় সাঈদ সম্পর্কিত বিদ্যমান সমালোচনাকে বিশ্লেষণের পাশাপাশি, অ্যাবসার্ডবাদী চিন্তা, জাতীয়তাবাদ ও উদারনৈতিক মানবতাবাদী ভাবধারার নিরিখে তাঁর নাট্যসম্ভারও

*সহকারী অধ্যাপক, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্লেষিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই লেখার ইংরেজি উদ্ধৃতিগুলো বর্তমান প্রাবন্ধিকের নিজের অনুবাদ।

বিরাজমান সমালোচনার ছক

সাঈদ আহমদের বহুমুখী চর্চার মধ্যে নাটক লেখার ক্ষেত্রটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কীভাবে সাঈদ একজন নাট্যকার হয়ে উঠলেন এর উত্তর তালাশ করতে গিয়ে *সাঈদ আহমদ রচনাবলী*র সম্পাদক ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক হাসনাত আবদুল হাই ৪টি বর্গ পাঠকের পাতে তুলে দিয়েছেন। প্রথম বর্গে তিনি ইঙ্গিত করেছেন সাঈদের পারিবারিক মালিকানায় লায়ন থিয়েটারের প্রসঙ্গ। এটি ১৮৯৮ সালে ডায়মন্ড থিয়েটারের হিন্দু মালিকের কাছ থেকে তাদের পরিবার ক্রয় করেছিল। এর সূত্রে বাল্যবয়স থেকেই তাঁর নাটক দেখার সূচনা হয়। যদিও হাসনাত উল্লেখ করেছেন যে, "ভবিষ্যতে নাট্যকার হবেন এমন অভিলাষ তার তখনো মনে দেখা দেয়নি (হাই ২০১২ : দশ)।" দ্বিতীয় বর্গের আলোচনায় হাসনাত দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে অনেকখানি নিশ্চয়তার স্বরে বলছেন "ক্লাসিকাল নয়, 'অ্যাংরি ইয়াংম্যানদের লেখা নাটক দেখে ও পড়ে তাঁর নাট্যভাবনা গড়ে ওঠে" (হাই ২০১২ : এগার)। ক্রুদ্ধ ইংরেজ যুবকদের ভাবনার সাথে সাঈদের পরিচয় ঘটে বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে প্রথম যৌবনে যখন তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডনে যান। তখনকার সমকালীন নাটকে এস্টাবলিশমেন্টের বিরোধিতার সাথে "বিশেষত তরুণ প্রজন্মের হতাশাজনিত" (হাই ২০১২ : দশ) প্রতিবাদের সাথে সাঈদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল বলে হাসনাত তথ্য দিয়েছেন ।

হাসনাত তৃতীয় বর্গে সাঈদের নাট্যকার হয়ে ওঠার প্রেরণাসূত্র হিসেবে করাচির অভিনেতাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন–"পঞ্চাশের শেষ দিকে দেশে ফিরে সরকারি চাকরি ব্যাপদেশে করাচি শহরে থাকার সময় তিনি কিছু শখের অভিনেতার সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাদের পরীক্ষামূলক নাটক দেখেন"(হাই ২০১২: এগার)। উত্তরকালে সাঈদের নাটকের নিরীক্ষাধর্মিতার সাথে এই তথ্যকে নিশ্চিতভাবেই সমীকরণ করা যায়।

চতুর্থ বর্গে আমরা দেখছি, পাশ্চাত্যের অ্যাবসার্ডবাদী নাটকের আঙ্গিক ও বিষয় সাঈদের নাটকে যে সংশ্লেষিত হয়েছে হাসনাত খুব সরাসরি সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এর সপক্ষে হাসনাত ড্রামা সার্কলের অন্যতম উদ্যোগী ও নির্দেশক বজলুল করিমের বক্তব্যেরও দোহাই দিয়েছেন। হাসনাত নিজের সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্যে বলেছেন, "নাটক সম্বন্ধে তাঁর চোখ খুলে যায় স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোদো' ধরনের অ্যাবসার্ড নাটক পড়ে। এর অব্যবহিত পরই তিনি পরিচিত হন আরেক অ্যাবসার্ড নাট্যকার ইউজিন আয়োনেস্কোর নাটকের সঙ্গে। শুধু পড়েই তাদের বিদঘুটে, অদ্ভুত ধরনের নাটক তাঁকে দারুণ প্রভাবান্বিত করে। এইসব নাটকের অস্বাভাবিক কাহিনী, প্লটের অভাব অথবা উচ্ছৃঙ্খল গঠন, সংলাপের সংক্ষিপ্ততা ছিল [সাঈদকে] আকর্ষণ

করার বাইরের দিক। এদের ভেতরে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন আধুনিক ব্যক্তিমানসের অস্থিরতা, ক্ষ্যাপামি, বেপরোয়া মানসিকতা, কৌতুক ও হাস্যবোধ এবং সর্বোপরি বুদ্ধির উজ্জ্বল ঝলক" (হাই ২০১২ : এগার)।

বাংলাদেশের নাগরিক থিয়েটার অনেকান্ত অবলোকন নামের বইয়ে সংস্কৃতি-ভাবুক ড. বিপ্লব বালা "নাগরিক বাংলা থিয়েটারে" দেশজরীতি কীভাবে শিকড় গেড়েছে সেই প্রশ্নের উত্তর তালাশ করেছেন হরেক রকমের দৃষ্টান্তে। এক্ষেত্রে সাঈদ আহমদ সম্পর্কে সিদ্ধান্তমূলক পদ্ধতিতে বিপ্লব বালার ক্ষিপ্রগতি-মন্তব্য হলো, "সাঈদ আহমদের 'কালবেলা', 'মাইলপোস্ট' নাটকে লোকরীতির সঙ্গে আধুনিক নাট্যপদ্ধতি অন্বিত" (বালা ২০১৫ : ৩৮)।

যদিও লোকরীতি কী ও আধুনিক নাট্যপদ্ধতি কী এবং কীভাবেই বা সাঈদ স্বরচিত নাটকে এই দুইয়ের অন্বয় ঘটিয়েছেন সেটি তিনি ব্যাখ্যা করেননি ।

থিয়েটার বিষয়ে ইন্টারডিসিপ্লিনারি পদ্ধতিতে সমালোচনামূলক গবেষণায় পণ্ডিত অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ সমকালীন বাংলাদেশের থিয়েটারে বাচনের নকশা কীভাবে আঁকা হয়েছে এর তত্ত্বতালাশে তিনভাগে বিভক্ত একটি অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা হাজির করেছেন "ডিজাইনস অফ লিভিং ইন দি কনটেমপোরারি থিয়েটার অফ বাংলাদেশ" প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগের নাম আর্টিকুলেশনস অফ সাবল্টার্ন রেজিসটেন্স, বাংলায় বলা যায়, নিম্নবর্গের প্রতিরোধের রূপায়ণ। ওই অংশে জামিল আহমেদ বদরুদ্দীন ওমরের বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্যা বইয়ের একাংশের আলোচনার সারমর্ম হিসেবে তুলে ধরে বলেন, ১৯৪০'র দশক ও ১৯৫০'র দশকের প্রথম দিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ [পাকিস্তান] রাষ্ট্রের সামন্তবাদী ও ধর্মীয় ভাবাদর্শ প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়ে ওঠেছিল। এর মধ্যেদিয়ে প্রকাশ পায় সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপরীত ভাবাদর্শ, যার মূলে গণতান্ত্রিক ও সেক্যুলার মূল্যবোধ [কাজ করে], এমনকি শ্রেণী-সচেতনতার সাথেও [ওই বিপরীত ভাবাদর্শের] সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পর্যায়ক্রমে, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে বেশকিছু কৃষক আন্দোলন যেমন ভেভাগা, নানকার, টঙ্ক ও নাচোলে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। কিন্তু সেই সময় এগুলোর কোনোটিই পারফরম্যান্সের 'কাল্পনিক' প্রতিবেশে কোনো খোরাক জোগাতে পারেনি (Ahmed 2014 : 147)। এরকম একটি সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিতে প্রায় ১৫ বছর পর, জামিল আহমেদ উল্লেখ করছেন যে, ১৯৬৫ সালে বাস্তব ও থিয়েটার, উভয়ক্ষেত্রই যখন শ্রেণী শোষণের বিরুদ্ধে যে কোনো প্রতিরোধের রূপায়ণ থেকে বিচ্ছিন্নতায় ভুগছে, ঠিক সেই সময় সাঈদ আহমদের *মাইলপোস্ট* নাটকটি বাংলা একাডেমিতে মঞ্চস্থ হয়। জামিল আহমেদের ইংরেজি বক্তব্যটি অনুবাদ করলে অর্থ দাঁড়ায় যে "সাঈদ মার্কসবাদী বয়ান পরিহার করে, বাচনের এমন এক নকশাকে তাঁর নাটকের ভেতরে বুনেছেন যা বেকেটিয় ধমনী থেকে আসা এক অ্যাবসার্ড ভিশন বা রূপকল্প" (Ahmed 2014 : 147)।

বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৭৯ সালে ইংরেজিতে প্রকাশিত সাঈদের *দ্য মাইলপোস্ট* ও এর প্রযোজনার উপাত্ত পাঠ করে জামিল আহমেদ বিচার করছেন জনগণ যদি তাদের জীবন উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত থাকে তবুও স্যালভেশন বা পরিত্রাণ অসম্ভব কিনা এই সংশয়ে ভোগে নাটকটি। তাই সাঈদ আহমদের এই নাট্যভাষ্যকে জামিল আহমেদ 'মেটাকমেন্টারি' বা 'মহাভাষ্য' আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, এই নাটকটি ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে একান্তই এক ভুল প্রতিরূপায়ণ (Ahmed 2014 : 148)। কারণ পাকিস্তানের জন্মের পর বৃহত্তম গণজাগরণের ওই সময়টাতেই রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে ছয়জন জীবনোৎসর্গ করেছিল এবং প্রায় সর্বস্তরের কৃষক-লেখক-শিল্পী-ছাত্র-শ্রমিক এমনকি সরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে নিম্ন ও মধ্য বেতনভোগী কর্মচারীরাও তৎকালীন বিরোধী দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শামিল হয়ে আইয়ুব শাহীর পতন ঘটিয়েছিল। ফলে, নাটক ও সমকালীন বাস্তবতার রসায়নের প্রেক্ষাপটে যুক্তি ও তথ্যের নিরিখে জামিল আহমেদের মূল্যায়ন হলো, সাঈদের *মাইলপোস্ট* নাটকে দেখা যায় জনগণ জীবনোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত থাকলেও পরিত্রাণ অসম্ভব–এই মেটাকমেন্টারি সেই সময়ের অর্থাৎ ৬৯-র গণঅভ্যুত্থানের বাস্তবতা ও এর ফলাফলের নিরিখে সত্য নয়, বরং জীবনের বিনিময়ে রাজনৈতিক পরিত্রাণ আসে।

বিপ্লব বালার ভাবনাসূত্র থেকে পাওয়া দুটো ধারণা 'লোকরীতি' এবং 'আধুনিক নাট্যপদ্ধতি'র মধ্যে যদি দ্বিতীয় ধারণাটিকে আপাতত সামনে নিয়ে আসি, তাহলে জামিল আহমেদের বিশ্লেষণী সমালোচনা থেকে পাওয়া একটি ধারণার সাথে সম্পর্কিত করা সম্ভব। *মাইলপোস্ট* সম্পর্কে জামিল এও বলেছেন যে, এ নাটকে বেকেটিয় ধমনি থেকে আগত অ্যাবসার্ড ভিশন প্রবাহিত হয়েছে। তাহলে বিপ্লব যে 'আধুনিক নাট্যপদ্ধতি'র কথা বিমূর্তভাবে বলেছেন, সেটাই জামিলের পর্যালোচনায় সুনির্দিষ্টভাবে অ্যাবসার্ড ভিশন রূপে মূর্তমান হচ্ছে। সৈয়দ জামিল আহমেদ ও বিপ্লব বালার সমালোচনার সূত্রে আমরা এগিয়ে জিজ্ঞাসু হতে পারি এই উত্তরের লক্ষ্যে যে, তাহলে সাঈদ আহমদের ড্রামাটার্জি বা নাট্যতত্ত্ব কী?–এই প্রশ্নরেখা ধরেই প্রমাণসাপেক্ষে আমরা প্রস্তাব করতে পারি পাশ্চাত্যের আভাঁগার্দ অ্যাবসার্ড ধারাটি বাংলা নাটকে সংশ্লেষণের রূপকার হলেন সাঈদ আহমদ।

এবার, জামিল আহমেদের প্রতিপাদন থেকে আলোকিত হয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করবো যে, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে সাঈদের *মাইলপোস্ট* নাটক যদি একটি ভুলরূপায়ণ (মিসরেপ্রিজেন্টেশন) হয়ে থাকে, তাহলে নাটক কি শুধু এর রচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের কালেরই রূপায়ণ? নাকি পাশাপাশি একটি নাটক কালাতীতেরও রূপকল্প হতে পারে! আমরা জানি যে, থিয়েটার কালের মাত্রা ও স্থানের নির্দিষ্টতায় গঠিত এক শিল্প। সেক্ষেত্রে নাটক (সেটি যখন ১৯৬৫ সালে মঞ্চস্থ হয়, এটি আবার ২০১৫ সালেও মঞ্চস্থ হতে পারে) থিয়েটারেরই একটি সবিশেষ উপাদান হিসেবে, এমনকি পাঠযোগ্য সাহিত্যরূপেও গতকালের জন্য যা ছিল আপাতত, আজ ও আগামীকালের জন্য তা

হতে পারে চিরায়ত। সৃষ্টির একটি বড়ো লক্ষণই হলো সময়ের নিরিখে এর নিহিত প্যারাডক্স। কারণ, শিল্প একই সঙ্গে আজকের এবং আজকের নয়। আজকের নয় বলেই এটি ভাবীকালের। জামিল আহমেদের প্রতিপাদনের হিসেবে, সাঈদ আহমদের *মাইলপোস্ট* যদি ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে ভুলরূপায়ণ হয়ে থাকে, তাহলে এই প্রশ্নও তো আমরা তুলতে পারি যে, নাটকটি মঞ্চায়নের আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী পর দৈশিক ও বৈশ্বিক বিভিন্ন ঘটনাবলি, বিশেষত সশস্ত্র পুঁজিবাদের দামামা, প্রতিরোধের 'জেহাদি' ব্যাকরণ ও ইহুদি জাত্যভিমানের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ 'ক্রুসেডের' মল্লযুদ্ধে থাকা এই পৃথিবীতে আত্মাহুতির ফলে পরিত্রাণ কি ঘটেছে কিংবা পরিত্রাণের পূর্বাভাস কি আদৌ শুনতে পাওয়া যায়? তবুও মানুষের বাঁচনের মর্মার্থ কী? পরিত্রাণ অসম্ভব, যখন এই সংশয়ে সবাই বিরাজ করে, তখনো মানুষ কেন বাঁচে? –এই সমুদয় প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আমাদের বলবার থাকে, ১৯৬৯ সালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সাঈদ আহমদের নাটকটি ভুলরূপায়ণ হলেও, এর চিরায়ত প্রাসঙ্গিকতা আজকের দিনেও হারাবার কোনো অবকাশ থাকে না। কারণ, সাঈদের সেই নাটকটি কী কেবল "পরিত্রাণের" ধারণার নিরিখেই অর্থবহ, নাকি এর আরো অর্থ খুঁজে নেয়া যায়? এমন কি পরিত্রাণ বিষয়ক সংশয়ের অ্যাবসার্ডবাদী উপস্থাপনার অন্য আরো অর্থ কি নির্মাণ করা যায় না? এজন্যই সাঈদের নাটকে সংশ্লেষিত অ্যাবসার্ড রূপকল্পজনিত ভাবনার আদ্যোপান্ত জোরালোভাবেই তদন্তযোগ্য বিষয় হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে সাঈদ আহমদ সম্পর্কে জামিল আহমেদের বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ১ম অংশটিকে তুলনামূলকভাবে সাঈদের নাট্যতত্ত্বের অনুসন্ধানে অধিকতর প্রয়োজনীয় অনুচিন্তন বলে গ্রহণ করে আমরা ব্যবচ্ছেদ করবো বেকেটিয় ধমনি কী ও এর থেকে প্রাপ্ত অ্যাবসার্ড ভিশনইবা কী। পাশাপাশি, সাঈদের নাটকে অ্যাবসার্ড ভিশন কীভাবে সংশ্লেষিত হয়েছে যার দরুণ নাট্যকার হিসেবে সাঈদের উদ্ভাবনশক্তি, আপাততের গণ্ডি পেরিয়ে চিরায়তের দাবি মেটাতে লক্ষণযুক্ত কিনা সেটি তদন্ত করার পরেই কেবল নাট্যকার সাঈদ আহমদ সম্পর্কে বিচার-বিবেচনাসম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা হাজির করা সম্ভবপর হতে পারে। এবং এই পর্যালোচনায় আমরা এও নিরীক্ষা করার সুযোগ নেব যে, সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে চিরায়তের ভাবনা নিয়ে উড়ালের কথাও অ্যাবসার্ড ভিশন বলে কিনা।

নিরীক্ষার অন্য দ্রাঘিমায় অ্যাবসার্ড রূপকল্প ও বাংলার মেটাফর

অতএব, সাঈদ সম্পর্কে বিদ্যমান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত সমালোচকদের বিরোধপূর্ণ ভাবনা আলোকপাত না করলে সাঈদ বিষয়ক বাহাস তার সামগ্রিকতা নিয়ে শাখা-প্রশাখা মেলতে পারবে না। ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত সমালোচনা ও বিশ্লেষণের সূত্রে সাঈদের দ্বিতীয় নাটক *মাইলপোস্ট* আলামতেই প্রথমে আমরা ময়নাতদন্ত চালাব। এ প্রয়োজনে আবারও *সাঈদ আহমদ রচনাবলীর* সম্পাদক ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক হাসনাত আবদুল হাইয়ের আলোচনা ধরে এগুনো যাক। হাসনাত অবগত করছেন,

"সাঈদ আহমদের দ্বিতীয় নাটক *মাইলপোস্টে*র রচনাকাল ১৯৬২-১৯৬৪। নাটকে দুর্ভিক্ষের সময়ে কয়েকটি চরিত্রের সংলাপের এবং ন্যূনতম ঘটনার ভিত্তিতে দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র আঁকা হয়েছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দার্শনিক মাত্রা যেখানে দুর্ভিক্ষকে দেখানো হয়েছে মানুষের আত্মার পতন হিসেবে। নাটকে সিদ্ধান্তহীনতার মানবিক অসহায়তা ফুটে উঠেছে" (হাই ২০১২ : বার)।

এই প্রসঙ্গে নাটকটির ভূমিকায় লেখা নাট্যকারের একটি মন্তব্যকে উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে হাসনাত উদ্ধৃতিও দিচ্ছেন, "দুর্ভিক্ষ যে শুধু নিরন্নের হাহাকার নয়, মানবাত্মার সঙ্কটের তীব্র আর্তনাদও–এই তথ্য প্রকাশের তাগিদে মাইলপোস্ট লেখা হয়" (হাই ২০১২: বার)। বক্তব্য কী, এর চেয়ে, বক্তব্যটি কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই অনুসন্ধানের তাগিদ থেকে আমরা দেখবো হাসনাত ও আতাউর রহমানের সিদ্ধান্ত থেকে প্রস্থান করে অন্য সিদ্ধান্ত হাজির করছেন জামিল আহমেদ। কারণ হাসনাতকে বলতে দেখছি, "এটি অ্যাবসার্ড নাটক নয় যদিও সংলাপে কখনো কখনো তার আভাস পাওয়া যায়। একে বলা যায় আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক নাটক" (হাই ২০১২ : বার)। সম্পাদকের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন নাটকটির অনুবাদক আতাউর রহমানের বক্তব্যেও প্রতিধ্বনিত হয়– "সাঈদ আহমদের নাটকের বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন কিছু নয়। তার নাটক বাংলাদেশের নিত্যসহচর তুফান, বন্যা ইত্যাদি সমস্যাকে নিয়েই। তবে তার উপস্থাপনা পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু থেকে নিয়ে নাটকীয় চরিত্রসমূহের ট্রিটমেন্ট ইত্যাদি সব ট্রাডিশনাল অর্থে প্রাচ্যের বা বাংলাদেশের নয়" (হাই ২০১২ : বার)। আতাউরের বক্তব্যের মধ্যেও নিহিত স্ববিরোধ সহজেই পাঠকের কাছে প্রতীয়মান হয়। একবার তিনি বলছেন সাঈদের নাটকের বিষয় "বাংলাদেশের নিত্যসহচর সমস্যা", আবার একই বাক্যে বলছেন, এগুলো প্রচলিত অর্থে "বাংলাদেশের নয়।" এর অর্থ হলো, সাঈদ আহমদের নাটকের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনা রীতি তাদের বিশ্লেষণ থেকে সম্পূর্ণরূপে আহরণ করা যাচ্ছে না। তাহলে এই পর্যায়ে, সাঈদের নিজের বক্তব্যকেই আমার প্রস্তাব বিশ্লেষণের সপক্ষে দালিলিক সূত্র হিসেবে গ্রহণ করতে চাইবো। পাশাপাশি, এও ভুলছি না যে, মিশেল ফুকোর "হোয়াট ইজ অ্যান অথর" এবং রোলাঁ বার্থের "দ্য ডেথ অফ দ্য অথর" থেকে সেই ভাবনাগুচ্ছ যার মাধ্যমে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, [পাশ্চাত্যের] প্রচলিত চিন্তায় একজন রচয়িতাকে প্রাথমিক সূচনাকারী ও উদ্দেশ্যাবলির পরিকল্পক হিসেবে সকল জ্ঞানের উৎস মনে করার বিষয়টি পরিহার্য। কারণ রচয়িতার এজেন্সি/চালিকাশক্তি কোনো নিজে নিজেই সন্নিহিত, উদ্দেশ্যমূলক ও নির্ণায়ক মনুষ্যকর্তা নয়, বরং মনুষ্য সত্তা হলো অনৈক্যবদ্ধ এক আপনসত্তা যে আবার বিচিত্র মনোযৌন শর্তের উৎপাদন মাত্র এবং সেই সত্তা এমনকি অজ্ঞান জবরদস্তির অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপের কাছেও সমর্পিত (Abrams 2000 : 240)। রোলা বার্থকে প্রতিধ্বনিত করেও আওয়াজ তোলা যেতে পারে যে, লেখালেখি সর্বদা সামাজিক ও ভাবাদর্শিক মূল্যবোধগুলো দিয়ে ঠাসা থাকে, তাই ভাষা কখনোই নিষ্পাপ নয় (Macey

2000: 30) এই তর্কের সূত্রে তাই সাঈদের নাটকের নিবিড় পাঠে কেবল সাঈদকেই দোহাই মানছি না, ঠিক বর্তমান প্রসঙ্গের নিষ্পত্তির প্রয়োজনে বিশেষভাবে জামিল আহমেদ ও ক্ষেত্রবিশেষে বিপ্লব বালার দোহাই মেনে, এমনকি প্রয়োজনবোধে তাদের সাথে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে সূচিত বিতর্ক অব্যাহত রাখার মাধ্যমে প্রস্তাব পর্যালোচনা করবো।

প্রথমেই নিরিখ করবো সাঈদের জবান কী অর্থ উৎপাদন করে? বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *এয়োনেস্কোর দুটি নাটক* শীর্ষক বইয়ের মুখবন্ধে সাঈদ আহমদ উল্লেখ করেন– "অল্প সময়ের জন্য এয়োনেস্কোর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ আমার হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে ওয়াশিংটন ডিসির জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি তখন নাটকের ওপর ক্লাস নিচ্ছি– এ সময় তিনিও নাটকের ওপর বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। দুজনের দেখা হলে কফি খেতে খেতে একসময় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আর কিছু লিখছেন নাকি?' তিনি হেসে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, কিছুদিনের মধ্যেই দেখতে পাবেন। তবে নাটকের শেষ পর্যন্ত বোধ হয় দু'জন দর্শকই উপস্থিত থাকবেন– আমি এবং আমার স্ত্রী।' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল 'অ্যাবসার্ড'" (এয়োনেস্কো ১৯৯০ : মুখবন্ধ)।

সাঈদ আহমদ মুখবন্ধটিতে আরো বলেন, "এ ধরনের নাট্যকারদের কাজ– 'বাস্তবে'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাচনভঙ্গির সক্রিয়তা, চিন্তাধারার জটিলতা এবং জীবনবোধের অসংলগ্নতা দর্শককে আর এক ব্রাহ্মিময় নিয়ে যায়" (এয়োনেস্কো ১৯৯০ : মুখবন্ধ)।

সাঈদ আহমদ নিজে যখন নাটক ও নাট্যকার সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করেছেন তখন লক্ষ্য করা যায় তিনি 'নিরীক্ষা'কে তার সমালোচনা পদ্ধতির প্রধান মাপকাঠিতে পরিণত করেছেন। সে কারণেই মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ বা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটকের মূল্যায়নে নিরীক্ষার মাধ্যমে সৃজিত নব্যতর শৈলীকে সাঈদ সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে, আমরা যখন একালে সাঈদের নাটক কিংবা নাট্যকার হিসেবে তার ড্রামাটার্জি বা নাট্যতত্ত্বের আলোচনায় অবতীর্ণ হবো তখন আমাদের ভুলে গেলে চলবে না এই 'নিরীক্ষা'র প্রশ্নটি। ২০০৫ সালে ইংরেজি দৈনিক *নিউ এজ* পত্রিকায় প্রকাশিত "মিটিং ইউজিন আয়োনেস্কো এট জর্জটাউন ড্রামা ফ্যাকাল্টি" নামের লেখায় সাঈদ ড. মারফি নামে তার এক বন্ধুর মন্তব্যের উল্লেখ করেন। সাঈদের উপস্থিতিতে ড. মারফি আয়োনেস্কোকে বলেন, অ্যাবসার্ড আঙ্গিকের আধুনিক নাটকের রচনায় সে [সাঈদ] বাংলার মেটাফর নিয়ে কাজ করে। তাহলে একে কেবল বিপ্লব বালা কথিত "লোকরীতি" বলাটাও সুবিবেচনাপ্রসূত নয়।

১৯৯৩ সালের ২০ এপ্রিল সাপ্তাহিক কাগজে মুদ্রিত "এই শতকের নাটক" নামের প্রবন্ধে সাঈদ যেমন ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রসঙ্গে বলছেন, "আধুনিক শিল্প চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সম্পূর্ণ নতুন কায়দায় এই ধরনের নিরীক্ষাধর্মী নাটক লিখতে শুরু করলেন" (হাই

২০১২ : ২২৬)। ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক রচনার বংশপরম্পরায় নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে সাঈদ নিজের নাটকের মূল্যায়ন করেছেন ওই "নিরীক্ষা"র পরিপ্রেক্ষিতেই–"সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ যেমন বাংলা নাটকে সর্বপ্রথম অস্তিত্ববাদী চেতনা সংযোজন করেন আমিও তেমনি অ্যাবসার্ড বা অধিবাস্তব চেতনা আমার নাটকের মাধ্যমে সংযোজন করি। এই নাটকগুলো হচ্ছে– 'কালবেলা', 'মাইলপোস্ট' এবং 'তৃষ্ণায়'। আমার নাটকে নায়ক কোনো মানুষ নয়, নায়ক হচ্ছে প্রকৃতি। কালবেলা নাটক সাইক্লোনের ওপর লেখা, মাইলপোস্ট দুর্ভিক্ষের ওপর লেখা এবং তৃষ্ণায় নাটকটি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লেখা। এখানে প্রতীক অর্থে নেয়া হয়েছে শিয়াল এবং কুমিরের গল্প ও চরিত্র। শিয়াল কুমিরের সব বাচ্চা একে একে খেয়ে ফেলে, সেই পুরনো লোককাহিনীর ওপর ভিত্তি করে নাটকটি রচিত হলেও মূলত পাকিস্তান সামরিক শাসনের পটভূমিতে আমার এই নাটক রচিত ছিল" (হাই ২০১২ : ২২৬)।

"নিরীক্ষার" মাধ্যমে ওই অ্যাবসার্ড "দ্রাঘিমায়" নিজের নাটক স্থাপন করতে সতত ইচ্ছুক নাট্যকার সাঈদ আহমদ যখন বলছেন "অ্যাবসার্ড ধারার নাট্যকারদের কাজ বাস্তব-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ", তখন আমাদের এ বিষয়ে মনোনিবেশ করার প্রয়োজন আছে। এ জন্য, ১৯৬১ সালে আমেরিকা থেকে প্রথম প্রকাশিত মার্টিন এসলিনের *দ্য থিয়েটার অব দি অ্যাবসার্ড* নামের বিখ্যাত বইয়ের শরণ নেব। এসলিন বলেছেন, "মানব দশার অ্যাবসার্ডিটির মধ্যে অধিবিদ্যাগত তীব্র মনঃকষ্টের বোধই হলো সাধারণভাবে বেকেট, অ্যাডামভ, আয়োনেস্কো, জেনে ও অন্যান্য লেখকদের নাটকের বিষয়" (Esslin 1985 : 24)। এসলিন অস্তিত্ববাদী থিয়েটারের সাথে অ্যাবসার্ড থিয়েটারের ফারাক খুঁজতে খোলাশা করে বলছেন, "অ্যাবসার্ড থিয়েটার মানবদশার অর্থহীনতার অর্থ ব্যক্ত করতেই সচেষ্ট হয়", পাশাপাশি এটি "যুক্তিবাদী পন্থা ও যুক্তিশৃঙ্খলভিত্তিক চিন্তার ধারাকেও খোলাখুলিভাবেই বর্জন করে" (Esslin 1985: 24)।

এই আলোচনার দিগন্ত আরো প্রসারিত করলে আমরা এসলিনের মাধ্যমেই খোঁজ করতে পারবো "অ্যাবসার্ড" বলতে আসলেই কী বোঝানো হয়? এখানে বলা দরকার, অ্যাবসার্ড-এর বাংলা ভাষায় সর্বসম্মত পরিভাষা নেই। স্বয়ং সাঈদ আহমদ অ্যাবসার্ড-এর বাংলা হিসেবে 'অধিবাস্তব' বলেছেন। এমনকি তার নাটকের নির্দেশক ও এদেশে সংবেদনশীল নাট্যচর্চার একজন পথিকৃৎ বজলুল করিমও 'অধিবাস্তব' বলেছেন। বাংলাদেশের চিত্রকলা সংক্রান্ত কিছু আলোচনায় 'উদ্ভট' বা 'কিম্ভূতকিমাকার' অর্থে অ্যাবসার্ড শব্দের বিকল্প প্রয়োগ খুঁজে পাওয়া যায়। তবে, এই আলোচনায় অ্যাবসার্ড শব্দের অনুবাদ করবো না, কারণ 'অধিবাস্তব' শব্দটি অ্যাবসার্ড যে-অর্থ প্রকাশ করে সেটি বহন করতে সক্ষম নয়, এমনকি অধিবাস্তব আসলে কী অর্থ প্রকাশ করছে, তাও স্পষ্ট হয় না। বাংলাভাষায় এটি অব্যয় এবং 'প্রাধান্য', 'আধিপত্য', 'আধিক্য' ইত্যাদিসূচক সংস্কৃত উপসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয় (হক ২০০০ : ১৯)। 'অধি' যোগে গঠিত শব্দগুলোর দিকে আমরা ফিরে তাকাতে পারি। অধিকার, অধিকর্তা, অধিদেব,

অধিনায়ক, অধিভুক্ত, অধিরাজ, অধিরূঢ়, অধিশায়িত, অধিষ্ঠিত–এই সকল শব্দ প্রাধান্য আধিপত্য আধিক্য অর্থেই প্রযুক্ত হয়। "অ্যাবসার্ড" অর্থে "অধিবাস্তব" যদি হয় তাহলে বাস্তবের আধিক্য, বাস্তবের প্রাধান্য, বাস্তবাতীত, এমন কিছুকেই "অ্যাবসার্ড" বুঝতে হবে। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় অ্যাবসার্ডের নানান প্রয়োগ এবং যে-সাহিত্যিক-দার্শনিক প্রেক্ষাপটে অ্যাবসার্ড শব্দের ব্যবহার, সেই বিবেচনায় কোনোমতেই 'অধিবাস্তব' অনুবাদ গ্রহণ করা যায় না। অ্যাবসার্ড শব্দের নানামাত্রিক অর্থ ও প্রয়োগের দৃষ্টান্ত তালাশ করলে একটু পরেই আমাদের কাছে তা স্বচ্ছ হবে। তাছাড়া, ইংরেজ ঔপনিবেশিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা গদ্যের বিকাশে আমরা দেখবো প্রচুর ইংরেজি শব্দের শোষণ-ক্ষমতাও এই ভাষার রয়েছে। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় বাংলা ভাষার ভেতরে বিদেশি শব্দ আত্মস্থ করার চলিষ্ণুতার নিরিখে অনুবাদ না করে সরাসরি 'অ্যাবসার্ড' শব্দটিওতো আমরা গ্রহণ করতে পারি।

"সাঙ্গীতিক পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাবসার্ড শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো ঐকতান নেই [যার]" (Esslin 1985 : 23)। এর আভিধানিক অর্থ "অযৌক্তিক; উদ্ভট; অদ্ভুত; অসমঞ্জস; হাস্যকর; কিম্ভূতকিমাকার; নিরর্থক" (Siddiqui 2003 : 4)। মার্টিন এসলিন আমাদের আবারও জানাচ্ছেন যে, সাধারণের বুলিতে অ্যাবসার্ড বলতে বোঝানো হয় রিডিকুলাস অর্থাৎ উপহাস্য, হাস্যকর বা উদ্ভট (Esslin 1985 : 23)। কিন্তু আমরা যখন অ্যাবসার্ড থিয়েটার নিয়ে কথা বলছি তখন আলবেয়ার কামু ঠিক ওই অর্থেই অ্যাবসার্ড শব্দটি ব্যবহার করেননি। কামু 'দ্য মিথ অফ সিসিফাস' লেখায় "বিশ্বাস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়া এক পৃথিবীর মানব পরিস্থিতি" চিহ্নিত করতে অ্যাবসার্ড শব্দটিকে স্রেফ শব্দ হিসেবে নয়, বরং প্রত্যয় হিসেব কাজে লাগাচ্ছেন:

"পৃথিবী যা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যাত হয়ে যাবে এটা [আমাদের] এই পরিচিত পৃথিবীতে একটা ভুল ধারণা। কিন্তু হঠাৎ মায়া ও আলো থেকে রহিত এই জগৎ সংসারে মানুষ এক আগন্তুক। সে এক প্রতিকার-অসাধ্য নির্বাসনে, কারণ প্রতিশ্রুত ভূমি ফিরে আসবে বলে এই আশারও যতটুকু অভাব তার আছে, ঠিক ততটুকু আবার তার হারানো মাতৃভূমির স্মৃতি থেকেও সে বঞ্চিত। মানুষ ও তার জীবনের মধ্যকার এই বিচ্ছেদ, অভিনেতা ও তার মঞ্চের মধ্যবর্তী এই বিচ্ছেদ, এটাই ঠিক অ্যাবসার্ডিটির অনুভবকে বিধিবদ্ধ করে" (Esslin 1985 : 23)।

অন্যদিকে, সাঈদের আরেকজন প্রিয় অ্যাবসার্ডবাদী নাট্যকার ইউজিন আয়োনেস্কো (যদিও সাঈদ এর বানান লিখেছেন 'এয়োনেস্কো') জার্মানভাষী চেক কথাসাহিত্যিক ফ্রানৎস কাফকা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে অ্যাবসার্ড ব্যাপারটিরই একটা সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন, "অ্যাবসার্ড সেটাই যেটা উদ্দেশ্যবিহীন... তার ধর্মীয়, অধিবিদ্যাগত ও তুরীয়ধর্মা সকল শিকড় কাটা গেছে। মানুষ নিরুদ্দেশ, তার সকল কার্যকলাপ বনে গেছে অর্থহীন, অ্যাবসার্ড, অপ্রয়োজনীয়" (Esslin 1985 : 23)।

মার্টিন এসলিনের ভূমিধস বইটির সর্বশেষ অধ্যায়ের আগের অধ্যায়ের নাম "দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দি অ্যাবসার্ড"। আদতেই এটা একটা দরকারি ভাবনা যে, এই জীবনে অ্যাবসার্ড নাটকের অর্থ-তাৎপর্য কী? এসলিন নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, "অবশেষে অ্যাবসার্ড থিয়েটার নামক এই প্রপঞ্চটি নৈরাশ্য কিংবা যুক্তিরহিত অন্ধকার শক্তিগুলোর দিকে ফেরা শুধু প্রতিফলিত করে না, বরং এটি আধুনিক মানুষের এক প্রচেষ্টাকে ব্যক্ত করে, যাতে সে যে-পৃথিবীতে বেঁচে আছে, সেই দুনিয়ার বাস্তবতাকে সম্যকভাবে বুঝতে পারে। অ্যাবসার্ড থিয়েটার বরং মানব-বাস্তব যেমন, তেমনেরই মুখোমুখি করতে প্রচেষ্টা করে। যে কোনো প্রকার হতাশা ও খাপ খাইতে না পারার ধ্রুব কারণগুলোর বিভ্রম থেকে মানুষকে মুক্ত করে" (Esslin 1985 : 428)। এখানে আরো ধর্তব্যের বিষয় হলো, "বাস্তবতার প্রকৃত স্বভাবকে কেবল তর্কমূলক দার্শনিক ভাবধারার ভাষা ও যুক্তি দিয়ে অনুধাবন করা সম্ভব নয়" (Esslin 1985 : 427)। "জেন বৌদ্ধ ধর্মের মরমী দর্শন যার ভিত্তি হলো ধারণাগত চিন্তার বর্জন"। এর থেকেও পাওয়া যায় সেই উপলব্ধি–

"বাস্তবতাকে উপেক্ষার অর্থ হলো বাস্তবতাকেই ব্যক্ত করা এবং শূন্যতাকে ব্যক্ত করার অর্থ হলো শূন্যতাকেই উপেক্ষা করা" (Esslin 1985 : 427)।

কিন্তু যদি মরমীবাদের চিত্রকল্প ও পদ্ধতিগুলোর সাথে খুবই মিলে যায় এমন কিছুই অ্যাবসার্ড থিয়েটার তুলে ধরে, তবে পাশাপাশি এটা কী করে সংশয়বাদকেও ব্যক্ত করে বলে গণ্য করা যায়, কী করেই বা এটি পরমসংক্রান্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গিগুলোর প্রতি বিনীত প্রত্যাখ্যানও জানায়?" (Esslin 1985 : 428)।

আদতে শিল্পভাষার নিগূঢ় লক্ষ্য হলো বাস্তব কী তার অবধারণ। অ্যাবসার্ডবাদীরা বাস্তবকে কী মনে করেন, এর একটি সংক্ষিপ্ততম কিন্তু শাণিত উদাহরণ হতে পারে ডেমোক্রিটাসের সেই উক্তি যা বেকেট নিজেও উদ্ধৃত করতে খুব পছন্দ করতেন– "কোনো কিছুই না-র চেয়ে কোনো কিছুই বেশি বাস্তব না" (Esslin 1985 : 426)।

এমনকি ডেমোক্রিটাস ও বৌদ্ধ দর্শনের বাইরেও যদি ইসলামের দর্শনে দৃকপাত করি তাহলে মর্মমূলে অনুধাবন করা সম্ভব যে, এর সারকথা ব্যক্ত হচ্ছে নঞর্থবোধকতায়। যেমন, লা ইলাহা অর্থাৎ নাই আর কোনো ইলাহ। ফলে সর্বপ্রথমেই "না"র মাধ্যমে অবধারণের এই পদ্ধতি মহাজগতের বাস্তবকে পাঠেরই এক বিশেষ পদ্ধতি। ওই নেতি, নাস্তি বা না-র মধ্যদিয়ে অ্যাবসার্ড থিয়েটারের যে গড়ন-বোধন তা-ই অ্যাবসার্ড ভিশন। তাহলে এমনকি, সাঈদ অহমদ যে বলেছেন "অ্যাবসার্ড ধারার নাট্যকারদের কাজ– 'বাস্তব'এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ" সেটিও যথার্থ নয়। বরং বাস্তবের নঞর্থবোধক অবধারণ হলো অ্যাবসার্ড ধারার নাট্যকারদের জীবন দেখার পদ্ধতিবিশেষ।

সাঈদ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ক্ষেত্রবিশেষে অ্যাবসার্ড ভিশনকে চিহ্নিত করতে বিভ্রান্তিতে ভুগলেও, ওই ভিশন নিজের সৃষ্টিশীল ক্ষেত্রে, অর্থাৎ তাঁর নাটকে সংশ্লেষিত করতে

চেয়েছেন, সেটা কী মাত্রায় কী প্রক্রিয়ায় তা অবশ্যই পর্যালোচনাসাপেক্ষ। তাই গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে সাঈদ আহমদের *মাইলপোস্ট* নাটকটি ভুল প্রতিরূপায়ণ কিনা তা ব্যাপার না, ব্যাপার হলো এটি আজকেও, এমনকি ভবিষ্যতেও, বাস্তবের অবধারণে প্রাসঙ্গিকতা রাখে কিনা।

মাইলপোস্ট ও অন্যান্য নাটক বিশ্লেষণ এবং জাতীয়তাবাদী চেতনায় গঠিত নাট্যতত্ত্বের হদিস

মাইলপোস্ট একটি একাঙ্কিকা। তিনটি দৃশ্যে বিভাজিত। প্রথম দৃশ্যের স্থান রাজপথ, সময় সূর্যাস্তের কিছু আগে। রাজপথের শূন্যতার মধ্যে একজন বুড়ো বয়সী চৌকিদার একটি মাইলপোস্ট নিয়ে ঢোকে। গন্তব্যকে প্রতীকায়নের প্রক্রিয়ায় এর সেটিংস গড়ে উঠেছে। সূর্যাস্তের আগে শেষ আলোর বন্যার ভেতর দিয়ে দর্শকের দিকে পেছন করে চৌকিদারের প্রবেশ, একটা যুক্তিরহিত পরিস্থিতির দিকে দর্শককে আমন্ত্রণ জানায়। চৌকিদারের প্রথম বাচনেই নাটকের অন্তিম পর্যন্ত ব্যক্ত হওয়া ঘটনাধারার একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত পরিহাসের মাধ্যমে ফুটে উঠে– "মনে হচ্ছে সবকিছুই ঠিকঠাক আছে, কোথাও কোন কিছুর ব্যতিক্রম নেই" (হাই ২০১২ : ৩২)।

অভ্যাসশাসিত বাস্তবতা এবং যুক্তির শৃঙ্খলায় অনুধাবিত বাস্তবতার বৈপরীত্যের ভেতর দিয়ে চৌকিদারের কার্যকলাপের সূচনা। যার ফলে দর্শকও প্রথমেই ইঙ্গিত পেয়ে যান এর নাট্যশৈলী সম্পর্কে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের গঠনে বিমূর্তায়নের পদ্ধতিতে গঠিত চৌকিদারের প্রথম সংলাপের প্রথম বাক্যের পরেই শোনা যায়– "বাঁশিতে ফুঁ দিই, একটা সুর বেরিয়ে আসে। মাইলপোস্টে আঘাত করি, তার শব্দ এসে কানে লাগে। যখনই হাসি, চোখের পানি গড়িয়ে পড়ে" (হাই ২০১২ : ৩২)। শ্লেষের মধ্য দিয়ে চরিত্রের শোক প্রকাশের বিশিষ্ট ধরন আমাদেরকে অন্য প্রস্তুতির ভেতর দিয়ে নাটকের ভেতরে নিয়ে চলে। পিঠে বস্তা করে অন্য লোক যে একজন গোরখোদক সে আসে।

'জীবাত্মার পাহারাদার' চৌকিদার গোরখোদককে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার বস্তার মধ্যে কি আছে'? প্রত্যুত্তরে গোরখোদক যখন পরিহাস করে জবাব দেয়, 'খাবার জিনিস', তখন চৌকিদারের পাল্টা উত্তর উন্মোচন করে দুর্ভিক্ষের পটভূমি– 'হতেই পারে না, আমি জানি ওটা এখন দুষ্প্রাপ্য (হাই ২০১২ : ৩৩)। প্রকৃতপক্ষে, গোরখোদক বস্তায় করে নিয়ে আসে মৃত মানুষের হাড্ডিগুড্ডি। চৌকিদার ও গোরখোদকের কথোপকথন সত্তার স্বরূপতাত্ত্বিক উন্মোচন ঘটায়:

গোরখোদক : আমি এইটুকুই বুঝি, আমাকে তুমি বুঝতে পার, কিন্তু যাওয়াকে নয়।

চৌকিদার : আসা এবং যাওয়া, কোনটাতে তুমি বেশি উৎসাহী?

গোরখোদক : আসা এবং যাওয়ার মাঝখানকার সময়টুকুতে (হাই ২০১২ : ৩৪)।

রাজপথের চৌকিদার যেন মানুষের গন্তব্য বিষয়ে সন্ধিৎসার প্রতীকী প্রশ্ন ছুঁড়ছেন এই সংলাপে, যা প্রাত্যহিক কিন্তু কবিতার গুণে বিশিষ্ট, সংক্ষিপ্ততার কৌশলে বিমূর্ত, সংলাপের অর্থ-তাৎপর্যে দার্শনিক এবং চৌকিদার এই প্রশ্নকে গ্রহণ করে যে-উত্তর দেয় তা আমাদেরকে এক জীবন-রহিত শূন্যতা ও স্থবিরতার মুখোমুখি করে। কেউ যদি না-ই আসে আর কেউ যদি না-ই যায় তবে এর মধ্যবর্তী থাকে কী? কেবলি সময়? কিন্তু সেই সময়কেইবা অনুধাবন কে করবে, সময়ের বোধনের জন্য তো চাই পাত্র-পাত্রী, মানুষ! মানুষ যদি কোনো স্থানে স্থিতই না থাকে, সময়ই বা কোন আধারে আধেয় হবে। এ সত্যিই এক উদ্ভট, অযৌক্তিক ও হাস্যকর মানবদশা। চৌকিদারের প্রশ্ন ও গোরখোদকের উত্তরে জীবনের এই ভাষ্য বাংলা[দেশের] নাটক সবিশেষ আত্মস্থ করে সাঈদ আহমদের মাইলপোস্টের মাধ্যমেই।

এই সংলাপের একটু পরেই, গোরখোদকের কথায় নিহিত শ্লেষ ও শোকের উপাদান চিহ্নিত করতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না যখন সে ঘিনঘিনে বৃষ্টিতে মেঘলা কালো সন্ধ্যায় এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাক্লিষ্ট অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলতে উদ্গার করে– "মেজাজটা খিঁচড়ে গিয়েছিল। দুনিয়ার সবকিছুকে অভিশাপ দিচ্ছিলাম। কেন এত কষ্ট?" (হাই ২০১২ : ৩৪)।

চৌকিদার এবং গোরখোদকের ক্রমাগত কথোপকথন মাইলপোস্টের বিষয়বস্তু এবং নাট্যকারের জীবনজিজ্ঞাসা একটি শিল্পভাষায় রূপ নিতে থাকে। এ শিল্পভাষা তুলে ধরে জগজ্জীবন সম্পর্কে এক অ্যাবসার্ডবাদী মনোভঙ্গি। আমরা যেন এক পর্যায়ে কামুর বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই চৌকিদারের বয়ানে– "হ্যাঁ আমরা দুজনই অজানার অন্ধকারে ডুবে রইলাম, তুমি কবর খুঁড়ে লাশ শুইয়ে দাও, আমি রাজপথে পাহারা দিই আর মাইলপোস্ট নাড়াচাড়া করি। আমরা কেউ কাউকে চিনি না। অনন্তকাল ধরে আমরা অর্থহীন। এ-ই আমাদের সবচেয়ে বড় মিল। আমরা মূর্খ। অচেনা আগন্তুক আমরা"(হাই ২০১২ : ৩৬)। এক অলঙ্ঘনীয় নিয়তির ছকে বাঁধা জীবনের অর্থহীনতা উন্মোচিত হয়। এই নিয়তি-নাটকের ক্রীড়নক হলো দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের ক্রীড়নক হলো মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মনস্তাত্ত্বিক শর্তাবলি যেমন অ্যাবসার্ড ভাবধারার প্রকাশকে স্ফূর্তি দিয়েছে, তেমনি বাংলাদেশের প্রতিবেশে দুর্ভিক্ষের ও খাদ্যাভাবের সামাজিক ইতিহাসের মাত্রাটিকে সাঈদ ব্যবহার করেছেন তাঁর নাট্যভাষার ভিত্তিভূমি হিসেবে। যদিও পশ্চিমা অ্যাবসার্ডিটির ভাব ও নাট্যতত্ত্বের আদি চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় ১৮৯৬ সালের আলফ্রেড জারির ফরাসি ভাষায় লেখা উবু *রই* বা উবু *দ্য কিং* নাটকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ত্রাসের পর অ্যাবসার্ড নাট্যধারা ফ্রান্সে আবির্ভূত হয়েছিল প্রচলিত সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের বিরোধিতার ভেতর দিয়ে, তবে এর নানান লক্ষণা-ব্যঞ্জনা পূর্ববর্তী অভিব্যক্তিবাদী ও পরাবাস্তববাদী শিল্পান্দোলনগুলোর মধ্যেও ফুটে উঠেছিল (Abrams 2000 : 1)। তথাপি একটি পূর্ণাবয়ব শিল্পান্দোলন হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটেই অ্যাবসার্ড নাট্যধারার

আত্মপ্রকাশ এবং এর সাথেই শৈল্পিক জারণ-বিজারণের একটি সম্পর্কে সাঈদ লিপ্ত হয়েছেন। সাঈদ নিজের নাটকে অ্যাবসার্ড রূপকল্প গড়তে উপযুক্ত বিষয়বস্তুর এষণায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ত্রাসের সাথে বাংলাদেশের নিত্যসহচর দুর্ভিক্ষকে সমীকৃত করেছেন। চৌকিদারের সংলাপ থেকে আমরা জানতে পারি–"দুর্ভিক্ষ ঘাসের কচি শিষটি পর্যন্ত খেয়ে নিঃশেষ করেছে। গায়ের চামড়া টানটান হয়ে ঢোলের মতো হয়ে গিয়েছে। ফোসকাপড়া গরমে সব পুড়ে দগদগে ঘায়ের জন্ম দিয়েছে। এ অবস্থার মধ্যে মানুষ আর মানুষ থাকতে পারে না" (হাই ২০১২ : ৩৮)। দুর্ভিক্ষতাড়িত নিয়তির বাক্সে আঁটা মানবের এমন এক দশা ফুটে ওঠে, যেখানে এই জগতের প্রতিক্রিয়া মানবজীবনের প্রতি তার রোষ ঘোষণা করে।

এই নাটকের প্রথম দৃশ্যের মাঝামাঝিতে সত্তার স্বরূপতাত্ত্বিক নঞর্থকতার উন্মোচনকে আরো গতিতীব্র করতেই যেন সাইকেল চালিয়ে আগমন ঘটে ডাকপিয়নের। দর্শনের যে শাখা সত্তার স্বরূপতত্ত্ব নিয়ে পর্যালোচনা করে সে অনটোলজির প্রধান প্রশ্নটিই, থলের ভিতরে এক তাড়া চিঠি নিয়ে আসা ডাকপিয়নকে করে চৌকিদার–'তুমি কে'? (হাই ২০১২ : ৩৭)। এই উদ্ভট মানবদশায় নিপতিত মানুষের জন্য এই নিগূঢ় প্রশ্নটিও অবান্তর ও হাস্যকর। সেটি প্রতীয়মান হয় তৎক্ষণাৎ গোরখোদকের বিস্ময়বোধক প্রত্যুত্তরে– "কী আশ্চর্য প্রশ্ন। পোশাক দেখে বুঝতে পারছো না ও একজন ডাকপিয়ন!" (হাই ২০১২ : ৩৮)। মানুষের এই আপাত ও নিহিত উভয় পরিচয়ের গোলক ধাঁধায় গোরখোদক নিজেই নিজেকে নির্ধারণ করতে সচেষ্ট হয়– "আমরা সবাই মৌলিক, আমাদের স্থান অপূরণীয়" (হাই ২০১২ : ৩৮)।

কিন্তু যখনি কিনা ডাকপিয়ন নাক গলাতে গিয়ে বলে, "আমি কিন্তু মৌলিক নই"(হাই ২০১২: ৩৮)। তখন চৌকিদার, গোরখোদক একে একে প্রত্যেকেই স্বীকার করে, এমনকি আবিষ্কারও করে, তারা কেউই মৌলিক নয়, উপরন্তু প্রত্যেকেই পূর্ববর্তী মৃতের স্থান পূরণ করছে মাত্র। এভাবে আত্মসত্তার মৌলিকত্বের বিশ্বাস ভেঙে পড়ার নিরীক্ষা, প্রতিপাদন ও সম্পর্কের রূপরেখা ধরে এগুতে থাকে নাটকটির প্রথম দৃশ্য যার শেষে লক্ষ্য করা যায় অন্য তিনজনের আবির্ভাব– "বড় ভাই ও ছোট ভাই একটি ঠেলাগাড়িকে ঠেলে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে। মা গাড়ির ওপরে বসা"(হাই ২০১২ : ৪১)। ওরা এই রাজপথে থামে "আলো দেখতে পাচ্ছে"(হাই ২০১২ : ৪৩) বলে। এদেরকে ঘিরেও আত্মপরিচয়ের ধাঁধা আরো জটিল-গ্রন্থিল হয়ে ওঠে, দুর্ভিক্ষের তাড়াখাওয়া মানুষ মৃত্যু আর জীবনের মধ্যবর্তিতায় তালাশ করছে তারা আদতেই কে! অন্য তিনজনের আত্মপরিচয়ের বিবৃতি শুনে মা বলে–"কিন্তু আমি যাদের জানতাম, তোমরা তারা নও। শুধু ছায়া। তাদেরই বিকৃত প্রতিবিম্ব। আমরা সবাই বিগত দিনের প্রতিভূ, একালের প্রেতাত্মা" (হাই ২০১২ : ৪২)। প্রেতাত্মায় পরিণত মানুষের ভেতরে বাঁচনের আশা থেকে যায়, সেই বাঁচনের আশ্রয় হলো শিল্প যেখানে "কল্পনাই আমাদের সম্বল"। তাই মা আহ্বান করেন– "তোমরা যদি সত্যিকারের ভূতের গল্প শুনতে চাও তবে আমার

কাছে সরে এসো। মরা মানুষের গল্প তো যে কেউই বলতে পারে। আমি জীবিতদের গল্প বলব। যারা এখনও প্রথম মৃত্যুর সুযোগ পায়নি" (হাই ২০১২ : ৪২)। এভাবেই শূন্যতায় দীর্ণ জীবনেও আশার বচন তুলে ধরেন মা।

দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান ওই একই রাস্তা। সময় প্রথম দৃশ্যের সন্ধ্যা অতিবাহিত হয়ে যাবার পর রাত্রি। মাইলপোস্ট কিছুটা সরে গেছে। এখানে এই দৃশ্যে একটা সাইকেল জুড়েছে। মঞ্চে আসে সঙ। বিপ্লব বালা লোকরীতির অন্বয় বলতে ঐতিহ্যবাহী দেশজ নাট্যের আঙ্গিক থেকে চরিত্রের বিন্যাস ও দর্শকের সাথে সম্পর্কের ধরনকে যদি বুঝিয়ে থাকেন তবে সেই ক্রমেই সঙের আবির্ভাব–একে আপ্তবাক্য বলে ভেবে নেবার আগে, আমরা আবারও পঞ্চাশের দশকে ইউরোপে দেখা দেওয়া অ্যাবসার্ড থিয়েটারের রূপকল্প নিরীক্ষণের গুরু মার্টিন এসলিনের দোহাই দিতে পারি। এক্ষেত্রে বেকেটের *ওয়েটিং ফর গডো* নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দুটো চরিত্রের সংলাপ লক্ষ করা যেতে পারে :

এস্ট্রাগন : পাতার মতো।

ভ্লাডিমির : বালির মতো।

এস্ট্রাগন : পাতার মতো

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির : ওরা সবাই এক সঙ্গে কথা বলে।

এস্ট্রাগন : প্রত্যেকে নিজের নিজের সঙ্গে।

[নীরবতা]

ভ্লাডিমির : ওরা ফিসফিস করে।

এস্ট্রাগন : শনশন করে।

ভ্লাডিমির : গুনগুন করে।

এস্ট্রাগন : শনশন করে।

[...]

এস্ট্রাগন : পাতার মতো।

ভ্লাডিমির : ছাইয়ের মতো।

এস্ট্রাগন : পাতার মতো (বেকেট ২০০৬ : ৯১-৯২)।

এসলিন অবগত করছেন আমাদেরকে, উপরে উদ্ধৃত "এই অনুচ্ছেদে আইরিশ মিউজিক হল কমেডিয়ানদের তীর্যক/পাল্টাপাল্টি কথাবার্তা (ক্রস টক) অলৌকিকভাবে রূপান্তরিত হয়েছে কাব্যে" (Esslin 1985 : 61)। কিন্তু সাঈদের নাটকের মুখ্য চরিত্রে দেশজ বিন্যাস এমন প্রক্রিয়ায় আত্মস্থ হয়নি। বরং বেকেটিয় অ্যাবসার্ড পদ্ধতির একটি সরলীকরণ ঘটেছে সাঈদের পদ্ধতিতে যেখানে দেশজ থিয়েটারের (বিশেষত সার্কাস

দলের) সঙ নামক সেই টাইপ চরিত্র *মাইলপোস্টে*র বিষয়বস্তুর বিশেষ বয়ানে একটি আলাদা চরিত্র হিসেবে সৃজিত হয়েছে। বেকেট যেখানে আইরিশ ঐতিহ্য থেকে কমেডিয়ানের অন্তঃসলিলা বৈশিষ্ট্যকে ঘননিবদ্ধ কাব্যের ভেতর দিয়ে দুটো মূল চরিত্রের সৃজনে ধারণাগতভাবে অন্যমাত্রা দিয়েছেন, সেখানে সাঈদ সোজা-সাপ্টা প্রকরণে একনিষ্ঠভাবে কমেডিয়ানের স্বতন্ত্র একটি চরিত্র সৃষ্টিতেই নিবিষ্ট থেকেছেন। ফলে, চরিত্রসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং সেই চরিত্রের পশ্চিমা ন্যাচারালিস্ট অভিনয়ের ধারা উপেক্ষা করে বরং দেশজ থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত চরিত্ররূপী অভিনেতা ও দর্শকের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের নিরিখে বলা যায়–সাঈদ সরলীকরণের প্রক্রিয়ায় অ্যাবসার্ড রূপকল্পের সাথে লোকরীতির অন্বয় ঘটিয়েছেন, যদিও তা আইরিশ মিউজিক হল কমেডিয়ানের ধরন আত্মস্থ হওয়া অ্যাবসার্ড রূপকল্পের পদ্ধতি থেকেই আহরিত।

এই নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য নাটকটির মুখ্য অভীপ্সা ব্যক্ত করে। বেকেটিয় অ্যাবসার্ড রূপকল্প যেমন কাব্যময়তা, সংক্ষিপ্ততা, হ্রস্বতা এবং নঞর্থকতা ও সদর্থকতার মিশেলে বিবিধার্থের দ্যোতনায়-ব্যঞ্জনায় বহুস্বরা এক স্থান-কাল-পাত্রাতীত বিমূর্ত সৃষ্টিকর্ম–যা এই দুনিয়াকে এই জীবনকে বোধনের চিরায়ত উপলব্ধি প্রদান করে। জীবন-বাস্তবতা অবলোকনের এই অ্যাবসার্ড রূপকল্প সাঈদের নাটকে আত্মস্থ হয়েছে আধুনিকতাবাদী মানবতাবাদের, বিশেষত জাতীয়তাবাদের সাথে সংশ্লেষাত্মক বয়ানরূপে। জাতীয়তাবাদ যেহেতু ভূগোল, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতির মধ্যস্থতায় একটি জনগোষ্ঠীকে ঐক্যের সংহত বোধ প্রদান করে, সর্বোপরি একটি সামষ্টিক রাজনৈতিক আত্মপরিচয় দেয়, সেহেতু সাঈদের নাটকেও দেখা যাবে শ্যামবর্ণা এক নারীর উপস্থিতি। এই নারীকে জাতীয় ঐক্যবোধের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আইকনরূপে কল্পনা করা হয়েছে নাটকটিতে। এবং একে শ্যামলী বাংলা মায়ের পরিপূরক সত্তা হিসেবেই রূপায়িত করা হয়েছে। বাঙালির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জন্মভূমিকে জননীরূপে কল্পনা করে ভৌগোলিক অখণ্ডতার সাথে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের মিশেলে গড়া শ্যামলী বাংলা বাঙালির সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদেরই প্রতীক। যেমন চৌকিদারের সংলাপে জাতীয়তাবাদী বয়ানের প্রতিচ্ছবি ফোটে এভাবে– "এদেশে হাসি-কান্না সবই বৃথা। আমাদের শ্যামলী বাংলা মা। মনে হয় কদিন আগে সে একবার ভুল করে হেসেছিল আর তখন থেকেই বিষাক্ত কুষ্ঠ পোকা তার হাড় কুরে কুরে খেতে শুরু করেছে। এ হলো তার হাসির মাসুল। সে রক্তবীজ বিস্তার করে চলেছে শতাব্দী ধরে প্রতিদিন পলে পলে, তিলে তিলে। সে এখন হাসতে ভয় পায়। ভয়াবহ দুঃখের ইতিহাস বাড়বে বলে। হয়তো আরো সাংঘাতিক মরণবাণ লুকিয়ে আছে" (হাই ২০১২ : ৪৮)।

সাঈদ *মাইলপোস্ট* নাটকে নিয়তির শাসন এবং এর মধ্যেকার উদ্ভট মানবদশার সর্বজনীন বিমূর্তায়ন থেকে সরে এসে এভাবেই বেকেটিয় অ্যাবসার্ড রূপকল্প থেকে প্রস্থান করেছেন। অ্যাবসার্ড শৈলীর পূর্ণতা রক্ষার দিকে নজর দেবার চেয়ে তার নাটকের স্থানীয়করণ মুখ্য হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে। ফলে জাতীয়তাবাদের বাহাসের

সঙ্গে নিজের নাটককে সংলিপ্ত করার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দায় বরণ করতেই নিজের সমস্ত নাট্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করেছেন। সেজন্যই তখনকার পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভেতরে সংকটাপন্ন জননীরূপী (পূর্ব)বাংলার আইকনোগ্রাফিক কণ্ঠস্বর মাইলপোস্টে হঠাৎ খুব তীব্রভাবে ও সরাসরি শুনতে পাওয়া যায়। এর ফলে অ্যাবসার্ড রূপকল্পের বিমূর্ততার বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা অব্যক্ত রাখার প্রবণতা, এমনকি রাজনৈতিক উত্তরণের সম্ভাবনার প্রতিই অনাস্থার ঝোঁকগুলো অস্বীকারের মুখে পড়ে। শ্যামলী বাংলা মায়ের আইকনরূপী প্রতীকী চরিত্র মাইলপোস্টের মা বলেন– "যখন আমি শুনলাম লক্ষ লক্ষ সন্তানের কথা, আমি যেন এক সাথে দেখতে পেলাম বাংলার সব মায়েদের। পরিশ্রান্ত, অসহায় ক্ষতবিক্ষত তাদের মুখ। আমি তোমাকে, ওকে, সকলকে দেখতে পেলাম। সবখানে দেখতে পেলাম আমার ক্ষুধার্ত শিশুদের মুখ। দেখতে পেলাম তাদের কীট-জর্জরিত আত্মা। দেখলাম কঙ্কালসার বাংলা মাকে, পরনে ছেঁড়া কাপড়, উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে" (হাই ২০১২ : ৫৩)।

মাইলপোস্টের মা এভাবে দুর্দশার বিজ্ঞাপন প্রদান করেন। বাস্তবতার অ্যাবসার্ডবাদী নিবিড় বিশ্লেষণকে সাঈদ মনে করেছিলেন "বাস্তবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ" হিসেবে। এভাবেই পাশ্চাত্যের অ্যাবসার্ড রূপকল্পের নন্দন ও নাট্যতত্ত্ব থেকে সাঈদ আহমদ প্রস্থান করেছেন প্রতিবাদ ও প্রচারণার সরলীকৃত হাতিয়ার হাতে নিয়ে। সাঈদের এই প্রস্থানে লোকায়ত ইসলামের সংশ্লেষ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন এই নাটকে একদিন মা খোয়াব দেখেন "সেই দিব্যপুরুষ একখণ্ড মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন" (হাই ২০১২ : ৫২)। মার জবানিতে শোনা যায়– "তার পরনে ছিল শ্বেতশুভ্র পোশাক– লম্বা ধবধবে সাদা দাড়ি, অপরূপ দীপ্তিময় কপাল আর মায়াভরা দুটি চোখ নিয়ে তিনি তার কথা শুনতে আমাকে অনুরোধ করলেন [...] আমি তার নিঃশ্বাস, তাঁর তসবি, তাঁকে, তার সবকিছুকে অনুভব করেছিলাম" (হাই ২০১২ : ৫৩)। সাঈদ পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভেতরে দুর্ভিক্ষকে প্রতীকায়িত করেছেন বাংলার মানুষের মুক্তির সমস্যা হিসেবে। অন্যদিকে, বিমূর্তভাবে যে কোনো স্থানের মানুষের সত্তাগত মুক্তির প্রশ্নটিও দুর্ভিক্ষের আকারে জারি থাকে এই নাটকে। নাটকটির বিষয়বোধে লক্ষ করা যায়, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরি কৃত্রিম রাষ্ট্র তৎকালীন পাকিস্তানের ঠুনকো ইসলামি ভাবাদর্শকেও সমস্যাজনক করে তুলেছেন নাট্যকার। তাই অজ্ঞাতনামা বাংলামায়ের খোয়াবনামা স্পষ্টতই ইঙ্গিত করে পূর্ববাংলার জনগণের মনে জাগরুক মুক্তির অভিলাষ। দরবেশ চিত্রকল্পের মাধ্যমে, এর কাঠামোগত অবয়বটিকে গ্রহণ করে বাংলামায়ের মুসলমান সন্তানদের নমনীয় ও উদার ইসলামি বিশ্বাসকেও আত্তীকৃত করেছেন। কোরবানির পুরাণকে প্রয়োগ করেছেন বাংলা মায়ের দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তির জন্য পুত্র উৎসর্গের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্ররূপী সেকুলার রাজনৈতিক সংগ্রামের সমীকরণে।

তৃতীয় দৃশ্যের সময় পরদিন ভোরবেলা ওই একই স্থান। তৃতীয় দৃশ্যে *ওয়েটিং ফর গডো* নাটকে গডোর জন্য প্রতীক্ষারত মানবজাতির যে মেটাফর দেখতে পাওয়া যায় এর স্থানীয়করণ ঘটিয়েছেন সাঈদ অ্যাবসার্ড ভিশনের বিমূর্তায়নের নীতি উপেক্ষা

করে। গডো যেখানে অনির্দিষ্টতাবাচক, *মাইলপোস্ট* সেখানে সুনির্দিষ্টতার ধারক। সাঈদের এই নাটকে দুই ভাইয়ের সংলাপ আসুন পরখ করি। বড় ভাই বলছে, "আমরা কোথায় যাব? কী করব? কোন আশাই কি আমাদের নেই?" (হাই ২০১২ : ৬৪)। এবং ছোট ভাই বলছে, "এখান থেকে আমরা এক চুলও নড়ব না। সেই দরবেশকে এখানে আসতেই হবে। উনি এভাবে আমাদের এড়িয়ে যেতে পারেন না" (হাই ২০১২ : ৬৪)।

এমনকি মায়ের সংলাপেও গডোর সমান্তরালে প্রতীক্ষার অবসানকল্প হিসেবে দরবেশ/ফকির স্পষ্টতই চিহ্নিত হয়– "আমি সেই ফকিরের জন্য অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করব" (হাই ২০১২ : ৫৩)।

এভাবে লোকবিশ্বাস থেকে আহরিত আইকন যার উৎস ইসলামি পুরাণ কিন্তু লোকসমাজে এর অস্তিত্বের সাংস্কৃতিক প্যাটার্ন এবং সাঈদের প্রয়োগের পদ্ধতি একটি সেক্যুলার কল্প তৈরি করে। যার মধ্যে প্রতিফলিত হয় মায়ের জাতীয়তাবাদী অন্তিম আকাঙ্ক্ষা–"আমার সোনা মানিকেরা, সাহস ধর। বাংলা মা'র মুখে হাসি ফোটাতেই হবে। নতুন ভোরের আলোর রশ্মি চারদিকে ছিটকে পড়ছে। এখন থেকে সোনালি ইতিহাস শুরু হবে" (হাই ২০১২ : ৬৫)।

অ্যাবসার্ড ভিশনের আপাত নঞর্থকতা থেকে স্পষ্টত সরে এসে নাট্যকার অর্থের বহুত্ববোধকতাকে সংকুচিত করে, সত্তার স্বরূপ অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিত থেকে অংশত প্রস্থান করে, সময়ের শুদ্ধতম গড়নকে অভিজ্ঞতায় ও অনুভবে বেকেটিয় মনোভঙ্গিকে অবশেষে নব্য বোধে জারিত না করে, কেবল একটি রাজনৈতিক ভাগ্যের সুন্দর ভবিষ্যৎ কল্পনার ফ্রেমে বেঁধে মাইলপোস্ট নাটকের বহুবিন্দুগত সম্ভাবনাকে নাট্যকার শুধুমাত্র একটি বিন্দুতে এনে স্থির করে দিয়েছেন। জীবনোৎসর্গের মাধ্যমে পরিত্রাণের সুরাহা না হলেও এই মা সন্তানদের সাহস আবাহন করেন। চরিত্রগুলোর নির্দিষ্টতার শর্ত অতিক্রম করে একটি সাধারণীকরণের রূপরেখায় বিজ্ঞাপিত হয় সোনালি ইতিহাসের আশাবাদ। এর ফলে, সাঈদের *মাইলপোস্ট* বিমূর্তায়নের মাধ্যমে মানবজীবনের নিরীক্ষা তুলে ধরার নাট্যকল্প হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া থেকে সরে যায় স্থানীয় জীবনের শিল্পভাষ্য সৃষ্টির ব্যাকুল প্রশ্নে। এর ফলে, একদিকে নাটকটির বেকেটিয় অ্যাবসার্ডবাদী ভিশন ক্ষুণ্ন হয়েছে, কিন্তু অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী বয়ানের নাট্যকল্প হিসেবে পূর্ণও হয়েছে। চরিত্রায়ণে ও রীতির দিক থেকে অ্যাবসার্ড দশার সংমিশ্রণের মাধ্যমে নিজের ভূখণ্ডের জনআকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে সাঈদ এই নাটকে নিজের স্বাক্ষর রাখতে বেশি চঞ্চল ছিলেন। এই কীর্তি সাঈদ আহমদের এসথেটিক পলিটিক্স বা শিল্পীর রাজনীতিকে তুলে ধরে।

সাঈদ আহমদের প্রথম নাটক *দ্য থিং* বা *কালবেলা*। এটি প্রথম ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছিল করাচিতে 'ভিশন' নামের একটি পত্রিকায়। ১৯৬১ সালে রচিত এই নাটকে একটা স্পষ্ট নৈরাশ্য ও পরাজয় প্রতিফলিত হয়। *কালবেলা* নাটকের উনেন যেন

ওয়েটিং ফর গডো নাটকের বালক, যে পুরোহিতের বার্তা নিয়ে আসে। *কালবেলার* উপেং পুরোহিত যেন বেকেটের *ওয়েটিং ফর গডো* নাটকের গডো। যার প্রতীক্ষায় অপেক্ষারত থাকে ভ্লাডিমির ও এস্ট্রাগন। কিন্তু সে কখনোই আসে না আর সে কারণে তাদের অপেক্ষাও কখনো শেষ হয় না। কিন্তু সাঈদের নাটকটিতে পুরোহিতের আবির্ভাব ঘটে। তবে চরিত্রদের মুক্তি ঘটে না, উল্টো বিলয় ঘটে। নাটকের ১ম অঙ্কে ঘূর্ণিবাত্যার আশঙ্কা। রহস্যময় মেয়েটি ভবিষ্যৎ বার্তার ঘোষণা। দ্বিতীয় অঙ্কে ঘূর্ণিবাত্যার মাধ্যমে সকলকে নিশ্চিহ্ন হতে দেখা যায়। মেয়েটি প্রথমে হাসে তারপর কাঁদে। ১ম অঙ্কে মেয়েটি নিবেদিতা যে বর্তমানের আধারে ভবিষ্যতের বাণী বহন করে। বর্তমান খেলাচ্ছলে কাটে কিন্তু প্রকৃতির ছোবলে মানবতার অস্তিত্বের বিনাশ ঘটে। চরিত্রগুলোর বিকাশ ও প্রবৃদ্ধির চেয়ে সমস্ত ব্যক্তিত্ব এই নাটকের বিষয়বস্তুর উন্মোচনের জন্য প্রযুক্ত হয়। মোড়ল চরিত্রের নাম ও উপস্থিতির মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রচ্ছায়া লক্ষ করা যায় এই নাটকে। চর আলেকজান্ডার নামের মধ্যে স্পষ্টতই এর দৈশিক রূপরেখা পাওয়া যায়। সাইক্লোনের তাণ্ডবের নিত্য ইতিহাসের সাথে বাংলাদেশের মানুষেরও এক নিত্যসম্পর্ক রয়েছে। নিয়তিবাদী সমাজের রূপরেখায় মানুষের নিরস্তিত্বের আশঙ্কার প্রতিফলন ঘটে এই নাটকে। এর রচনাকালের পটভূমির দিক থেকে ষাটের দশক। পাকিস্তানের সামরিক শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে এটি সে সময়কার দমনের বাস্তবতা তুলে ধরে। এবং ঘোর বিপদাপন্ন মানুষের মধ্যে অপরাধী, অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির সাথে আহাম্মদ, মুনীর ও মোড়ল যেমন রয়েছে তেমনি আছে উনেন ও উপেং উপজাতি। এর মাধ্যমে বাঙালির জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রকল্পনা বিস্তার লাভ করেছে। কারণ, বাঙালি জাতির বাইরেও বহুজাতিগত অস্তিত্বের আভাস মেলে এই চর আলেকজান্ডারে। কিন্তু এর পাশাপাশি, নিশ্চিতভাবে নাটকে আত্মস্থ স্থান ও কালের বিমূর্তায়নের পদ্ধতি, উপরে উল্লিখিত দৈশিক ও কালিক প্রেক্ষাপটকে অতিক্রম করে। বরং রহস্যময় ও অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক শক্তিমত্তার কাছে মানবতার পরাজয় রূপায়ণের মধ্যে এমন এক জীবনসম্ভাবনার রূপরেখা তৈরি করে এই নাটক, যাকে মানবশর্তের মধ্যে নিহিত বেদনার ভাষা দিয়েও বুঝতে হয়।

এবার চলুন, সাঈদ আহমদের তৃতীয় নাটক *তৃষ্ণায়* পাঠ করি। এ নাটকে একটি সমস্যা ব্যক্ত হয়েছে বলে নাট্যকার নিজেই বাণী দিচ্ছেন–"এ সমস্যা হলো মানুষের অস্তিত্বের এবং টিকে থাকার সমস্যা। বড় মাছ ছোট মাছকে উদরসাৎ করে। বৃহৎ শক্তি ক্ষুদ্র শক্তিকে ধ্বংস করে, এই তো স্বাভাবিক, চিরন্তন সত্য" (হাই ২০১২ : বার) কিন্তু আমরা যদি নাটকটির নিবিড় পাঠে মনোনিবেশ করি তাহলে দেখবো প্রথম অঙ্কে এর উন্মোচন, দ্বিতীয় অঙ্কে এর প্রবৃদ্ধি, তৃতীয় অঙ্কে সমাপ্তি। বাংলার লোককাহিনির ভিত্তিতে নাট্যকার জ্ঞানের কাঠামোকে রূপায়িত করেছেন। জ্ঞানগত কাঠামোর নির্যাস হলো শক্তি। শক্তির কাঠামো কাজ করে কেবল শক্তির মাধ্যমে নয়, হেজিমনির ভিত্তিতেও। হেজিমনি হলো বলপ্রয়োগে আদায় করা সম্মতির মাধ্যমে শোষণ বা ক্ষমতার চর্চা। ফলে, এই নাটকটি এক দিক থেকে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জবরদস্তিমূলক

সম্মতি আদায়ী সামরিক শোষণপ্রক্রিয়ার নাট্যভাষ্য। তবে এ নাটক কেবল সমকালীন নয়, নাট্যকারের অভীপ্সা হলো চিরকালীনতা। প্রতাপশালীর ক্ষুধার শেষ কোথায়? এই প্রশ্নের মাধ্যমে সাঈদ আমাদেরকে প্রবেশ করান অস্তিত্বের টিকে থাকার একটি বিশেষ প্রশ্নের মধ্যে। কিন্তু এই দার্শনিক প্রশ্নের রূপায়ণে নাট্যকার সাঈদ আহমদ রূপকের আশ্রয় নিলেন কেন? রূপক শিল্পের ভাষা হিসেবে সর্বাধিক পরোক্ষ বলে? আর পরোক্ষ বলেই প্রজ্ঞার উৎস–এই কারণে? এবার তাহলে আমরা এর জবাব তালাশ করবো।

পেঙ্গুইন ডিকশনারি অব ক্রিটিকাল থিওরি থেকে আমরা আহরণ করতে পারি, "অ্যালিগরি বা রূপক হলো কথনের অথবা দৃশ্যগত ছবির ধরন যার আক্ষরিক বা সোজা অর্থ এক বা একাধিক আরো অর্থকে মুখোশ পরিয়ে রাখে, প্রায়ই সেটা নীতিশিক্ষার প্রয়োজনে করা হয়ে থাকে" (Macey 2000 : 8)। রূপকের অনেক প্রকারভেদ আছে। এর মধ্যে কমপক্ষে দুটো ভাগ সামনে আসতে পারে, একটি হলো ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক রূপক এবং অন্যটি হলো ভাবগত রূপক (Abrams 2000 : 5)। রূপকে বয়ানের এই কৌশল ষোল শতকের পশ্চিমা মরালিটি প্লে-র ধরনে বিশেষভাবে দেখা যায়। ভাবগত রূপকে যেভাবে "আক্ষরিক চরিত্রগুলো কোনো ধারণা প্রকাশ করে এবং প্লট একটি বিমূর্ত ভাবনা থিসিস আকারে রূপায়িত করে" (Abrams 2000 : 5) ঠিক সেই কৌশলের সহযোগে সাঈদ বিস্ট ফ্যাবল বা পশুদের আচার-আচরণ কথাবার্তার মাধ্যমে নীতিকথার অবতারণা করেছেন। *তৃষ্ণায়* নাটকে দেখা যাবে উপকথার পশু পাখিদের মতোই গাধা, শিয়াল, কুমির ও কুমিরের বাচ্চারা অ্যানথ্রোপোমরফিক অর্থাৎ যে পশুরা মানুষের মতন। এই অ্যানথ্রোপোমরফিক চরিত্রসমৃদ্ধ কাহিনি বয়নের ধারা এই সংস্কৃতিতে নতুন নয়। প্রাচীন ধর্মীয় সাহিত্যে-দর্শনে জ্ঞানান্বেষার মধ্যে, মধ্যযুগের বিবিধ আখ্যানের ধারাতে সেটি লক্ষণীয়, এমনকি ঢাকার রিকশা পেইন্টিংয়েও দেখা যাবে কোনো শিয়াল ট্রাফিক সিগনাল নিয়ন্ত্রণ করছে। তেমনি পাশ্চাত্য দর্শনেরও এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো রূপক, বিশেষত প্লেটো থেকে তা উদ্ভূত এবং [তার] যুক্তি ছিল যে, বাহ্য দুনিয়া যা রূপকের মাধ্যমে প্রকাশিত তা আসলে এক উচ্চতর বাস্তবতারই সমতুল্য (Macey 2000 : 8)। ফলে রূপক হলো বাস্তবকে ব্যাখ্যার ও উন্মোচনের এক বিশ্বজনীন পন্থার প্যারাডাইম বা নমুনা যার আশ্রয়ে নিরীক্ষাপ্রবণ সাঈদ *তৃষ্ণায়* নাটকে মানুষের অস্তিত্বের সমস্যাই শুধু তুলে ধরেননি বরং মানবঅস্তিত্বের গাথা পশু-জীবনের অ্যানথ্রোপোমরফিক ভাষার নমুনা গ্রহণের মাধ্যমে জীবনের এক সম্ভাব্য বিকল্পের রূপরেখাও তুলে ধরেন। এই রূপরেখায় একদিকে সর্বপ্রাণের ভেতরে মানুষ যেমন তার মুক্তি খুঁজতে পারে, অন্যদিকে তেমনি বুভুক্ষু প্রতাপশালীর গ্রাস অনন্তকাল ধরে কি চলতেই থাকবে?–এই প্রশ্নও নেতিবাচকতার ভিশন বা রূপকল্প হিসেবে উত্থাপিত হয়।

তৃষ্ণায় নাটকে তাই একদিকে মানুষের চিরকালীন অস্তিত্বগত সমস্যার চিরন্তন রূপায়ণ ঘটে। অন্যদিকে, নাটক রচনাকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রতাপশালীর দমন অর্থাৎ

শৃগাল নামক পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কাছে কুমির নামক বাঙালির সন্তানদের দ্বিজাতিতাত্ত্বিক বিভাজনের প্রক্রিয়ায় সমর্পণের মাধ্যমে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যে আদতে নিঃশেষকরণেরই এক ভ্রমাত্মক ও মর্মান্তিক উদ্যোগ তারই এক সমকালীন রূপায়ণও ঘটে। আবার কোনো ক্ষমতামত্ত শাসকগোষ্ঠীর সাথে জনগণের সম্পর্কের ফাটল হিসেবে এই দ্বিতীয় রূপায়ণকেও এক কালাতীত পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ করা যায়। জনাথন সুইফট যেমন গালিভার'স ট্রাভেলসে আইরিশ-ইংলিশ ক্ষমতা-সম্পর্কটি তলে রেখে আরো অনেক অর্থ ঠেসে দিয়ে একে মানুষের রোমাঞ্চকর অভিযানেরও কাহিনিতে পরিণত করেছিলেন। সাঈদ আহমদও পরিচিত একটি রূপকের মাধ্যমে একই সঙ্গে জাতিতাত্ত্বিক বিরোধ ও ক্ষমতা চর্চার ধরনকে ইঙ্গিত করেছেন এবং এর একটি চিরন্তন মানবিক আবেদন সৃষ্টি করতেও তৎপর হয়েছেন।

তৃষ্ণায় নাটকে এই রূপকাশ্রয়ের পেছনে নাট্যকারের বিশেষ এক সৌন্দর্যবোধ ও গল্প-বলার প্রাচীন কৌশলেরও পরিচয় মেলে যা আরো খোলাসা হওয়া প্রয়োজন। কে আয়াপ্পা পানিকের *ইন্ডিয়ান ন্যারেটোলজি* বইয়ে দক্ষিণ এশিয়ার আখ্যানগুলোর দশটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন (Paniker 2003 : 3-17)। পানিকেরের কথার নির্যাস আহরণ করে বলা যায় রূপকায়ণ হলো এমন এক বিমূর্তায়নে সম্পর্কিত হওয়া, যা মূর্তমান করে বিস্তৃত অর্থ ও প্রাসঙ্গিকতা। এটি কেবল ভারতীয় বা দক্ষিণ এশীয় ধারণা নয়, এ এক দুনিয়াব্যাপী ধারা। রূপকের এই বিশ্বজনীন সংস্কৃতির কারণেই দক্ষিণ এশীয় পঞ্চতন্ত্র পৃথিবীজুড়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। জড়বস্তু এবং অমানবীয় প্রাণিগুলোর অনুভব, চিন্তা ও কথা বলার সক্ষমতাকে কাজে লাগানোর সাথে আদিকাল থেকে মানুষের সর্বপ্রাণবাদী এবং বহু প্রজন্ম ধরে পরিলক্ষিত হয়নি কিন্তু হঠাৎ কোনো ব্যক্তিতে সেই দোষগুণের পুনরাবর্তিতামূলক অধিসঞ্চারী বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত হয়ে [সাঈদ আহমদ] বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অ্যানিমেল ফ্যাবলের সম্ভাবনা (Paniker 2003 : 12) নিরীক্ষা করেছেন *তৃষ্ণায়* নাটকে। বিষ্ণু শর্মার পঞ্চতন্ত্রের ভূমিকায় চজন্দ্ররাজনের বিশ্লেষণসূত্রে পঞ্চতন্ত্রে পরিলক্ষিত (Paniker 2003 : 13) রূপকায়নের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বাঁধা গল্পের ব্যবহার, বাক্সে আঁটা গল্পের চর্চা, নৈতিক মূল্যবোধগুলোর উপর গুরুত্বারোপ, উপগল্পের অবতারণা, কোমল বিদ্রূপের উপাদান, সর্বোপরি পশুচরিত্রগুলোর জীবন্ত উপস্থাপন – ইত্যাকার বৈশিষ্ট্য *তৃষ্ণায়*ও ব্যবহৃত হয়েছে।

তৃষ্ণায়-র (১৯৬৪-১৯৬৬) ছয় বছর পর ১৯৭৪ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে সাঈদ আহমদের প্রথম নাটক *প্রতিদিন একদিন*। (হাই ২০১২ : বার)। এই নাটকের সংলাপে কোনো দ্ব্যর্থবোধকতা নেই বলে হাসনাতের মন্তব্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ধারণা পোষণ করতে পারি বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তিতে রাষ্ট্রকল্পনার বাস্তবায়ন অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ফলে পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক বিভ্রান্তির অবসান ঘটে গেছে বলে চরিত্রগুলোকে নাট্যকার এমনভাবে নির্মাণ করেছেন

যার পদ্ধতি হলো বাস্তববাদ। পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য যৌক্তিক অবধারণায় সাঈদ অ্যাবসার্ড রূপকল্প থেকে সরে এসে *প্রতিদিন একদিন* নাটকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে দেখেছেন এক প্রত্যক্ষ আলামত হিসেবে, যেখানে রহস্যময়তা, উদ্ভটতা ও কুহেলিকা আরোপিত শৈলী হিসেবে নিতান্তই বর্জনযোগ্য। তিনটি দৃশ্য সংবলিত নাটকের প্রথম দৃশ্য বর্তমান সময়ে মুক্তিযোদ্ধা রফিকের ড্রয়িংরুমে ঘটে। ফ্ল্যাশব্যাকের অতিব্যবহৃত পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে একাত্তর সালের রফিকের পিতার ড্রয়িংরুমে ঘটে দ্বিতীয় দৃশ্য। তৃতীয় দৃশ্যটি প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ। প্রথম দৃশ্যে একদল বন্ধু যারা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা। তারা একে বিপ্লব বলে অভিহিত করে এবং সেই বিপ্লবের ফলাফল নিয়ে আশা-নিরাশায় আক্রান্ত হতে হতে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর স্মৃতিচারণায় নিমজ্জিত হয়। সুন্দর ভবিষ্যতের ধারণা নিয়ে দ্বিতীয় দৃশ্যে মুক্তিযুদ্ধের সূচনার সময় তরুণ প্রজন্মের বিপ্লবী আদর্শের সাথে পুরনো প্রজন্মের বিরোধ প্রতিফলিত হয়। এতে নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধকে স্বপ্নবাজ তরুণদের বৈপ্লবিক ফসলরূপে চিহ্নিত করেন। কিন্তু তৃতীয় দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায় দ্বিতীয় দৃশ্যে রফিকের পিতা যেমন একাত্তর সালে আসন্ন মুক্তিযুদ্ধের ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, ঠিক একইভাবে যুদ্ধপরবর্তী খাদ্যাভাব ও হতাশার চক্রে মুক্তিযোদ্ধারাই আবর্তিত হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বধীনতা-পরবর্তীকালে একদল মুক্তিযোদ্ধার মুখ্যত নৈরাশ্যবাদী জীবনভাবনার রূপায়ণ সত্ত্বেও, নাটকটির শেষ সংলাপে আশাবাদী মুক্তিযোদ্ধা রফিকের বয়ান জাতীয়তাবাদী চেতনার কাঠামোকে উদারনৈতিক মানবতাবাদের প্রসারিত আঙিনায় নিয়ে যায়, যেখানে অস্তিত্বের একাকিত্বজনিত সংকটের ভেতরে দরদে দায়বদ্ধ বহুজনের সাথে একাত্মের ভাবনায় আশ্রয় নিয়ে অবশেষে রফিক কেবল দৈশিক নয়, বৈশ্বিক হয়ে ওঠে। সাঈদের নাট্যচিন্তার এই কেন্দ্রীয় প্রত্যয়, এই বিশ্বজনীনতার বোধ এ নাটকেও স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে।

সর্বসাকুল্যে "নাট্যকার সাঈদ আহমদ মাত্র ৫টি নাটক লিখেছেন, একটির সঙ্গে অন্যটির ব্যবধান দীর্ঘ সময়ের। আলস্য নয়, নিখুঁত করে লেখার তাগিদেই তাঁকে সময় দিতে হয়েছে প্রচুর" (হাই ২০১২ : তের)। সর্বশেষ নাটক *শেষ নবাব* দশ বছর ধরে লিখে ১৯৮২ সালে শেষ করেন। পলাশীর যুদ্ধ ও নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে এর আগেও গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তসহ অনেক নাট্যকারই লিখেছেন। কিন্তু সাঈদ আহমদ এক্ষেত্রে স্বকীয় বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রেখেছেন যা কবি শামসুর রাহমানের নিবিড় পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া যায় : "তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকারদের পথ মাড়াননি তিনি। যাতে তাদের লেখা তাঁকে প্রভাবান্বিত করতে না পারে সেদিকে কড়া নজর রেখেছেন। তাই সাঈদ আহমদের *শেষ নবাব* শেষ হয়েছে তিনটি অংকে, যেখানে দৃশ্য বিভাজন ঠাঁই পায়নি। তাঁর নাটকে প্রত্যক্ষবোধ ও রচনাশৈলীর ঘনবদ্ধতা বজায় রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কোনোরকম বাহুল্য কিংবা ফ্যান্টাসিকে প্রশ্রয় দেননি, অথচ তাঁর

পূর্ববর্তী নাট্যকারদের নাটকে সেই দুটি বিস্তর ডালপালা মেলে বসেছে (হাই ২০১২ : তের)।

উদারনৈতিক মানবতাবাদ এবং অন্যান্য মীমাংসা

ওপরের আলোচনাকে প্রামাণ্য উদাহরণ হিসেবে নিয়ে নাট্যকার সাঈদ আহমদ বিষয়ক আমরা কিছু সিদ্ধান্তমূলক মীমাংসায় আসতে পারি। অ্যাবসার্ড রূপকল্পে জাতীয়তাবাদী চেতনার সংশ্লেষ ঘটিয়ে সাঈদ আহমদ নাট্যকার হিসেবে আরো আত্মস্থ করেছেন লিবারাল হিউম্যানিজম বা উদারনৈতিক মানবতাবাদ। সাঈদ আহমদ নিশ্চিতভাবেই এক আধুনিকতাবাদ আত্মস্থ করেছেন যার শ্বাসমূল হলো উদারনৈতিক মানবতাবাদ। লিবারাল হিউম্যানিজম সম্পর্কে আলোচনার একটি নির্ভরযোগ্য হদিস মেলে ক্যাথেরিন বেলসির দ্য সাবজেক্ট অফ ট্রাজেডি নামের এক লেখায়। উদারনৈতিক মানবতাবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য যাকে এক বাক্যে বলা যায়, কমিটমেন্ট টু [হিউ]*ম্যান* হুজ এসেন্স ইজ ফ্রিডম। মানুষের প্রতি অঙ্গীকার, (এই মানুষের) নির্যাস হলো মুক্তি। উদারনৈতিক মানবতাবাদ প্রস্তাব করে যে, বিষয় হবে মুক্ত, তা হবে অর্থ (মিনিং অর্থে) ও কর্মের অবাধ রচয়িতা, আর (এটাই) ইতিহাসের মূল্য। অখণ্ড, জ্ঞানান্বেষী এবং সার্বভৌম মানবসত্তা এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা খোঁজে যেটি পছন্দ করার স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেবে। পশ্চিমা লিবারাল গণতন্ত্রের দাবি মতে, স্বাধীনভাবে পছন্দকৃত এবং এইভাবে মানবস্বভাবের অবাধ প্রকাশভাবনার উদ্ভব ঘটেছিল ১৬৪০-এর দশকে এবং ১৬৮৮ সালে ইংরেজ বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় সতেরো শতকের সংবিধানবাদের বিজয় ও ব্যক্তির উত্থানের সময়ে। কিন্তু ইতিহাসের প্রগতিতে দেখা যায় ব্যক্তি বন্ধনমুক্ত নয় (Oneonta 2016)। এই সমস্যাসমেত লিবারাল হিউম্যানিজমের সারাংশ অর্থাৎ মানবদশার মধ্যে থাকা সঙ্কট ও উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা সাঈদ আহমদের নাটকের জাতীয়তাবাদী অ্যাবসার্ড রূপকল্পে ব্যতিক্রমী উপাদান যুক্ত করেছে।

অতএব, সাঈদের নাটকে একদিকে, অ্যাবসার্ড রূপকল্পের আপাত নঞর্থকতা মিশেছে। অন্যদিকে, নাট্যনন্দনের ভাষা হিসেবে অভীপ্সিত বিমূর্তায়নের সাথে নিজের দেশ-কাল এসেছে যেখানে নাট্যকারের জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা খুব তীব্র। আবার, তাঁর নাটকের মধ্যে বিচিত্র ব্যাকগ্রাউন্ডের চরিত্রের সমাবেশ বহুত্ববোধক বাস্তবতার ধারণাকেই নির্মাণ করে, তবে, সাঈদের রাষ্ট্রকল্পনাভিত্তিক সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ বাঙালিত্বেও ধারণা অনুযায়ী একরৈখিক নয়, সেখানে তাঁর কথিত 'উপজাতি' আদিবাসীদেরও অস্তিত্ব আছে। চরিত্র নির্মাণে ব্যক্তিত্বের পূর্ণতাদানের চেয়ে নাটকের ইপ্সিত বিষয়ের উন্মোচন ও বয়ানের তাৎপর্য সাঈদের কাছে অধিকতর বিধায় চরিত্রের বিকাশ নয়, বিষয়ের বোধ সঞ্চারই প্রধান অভিমুখ হয়ে উঠেছে।

নিরীক্ষা প্রবণতার মাধ্যমে ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদী আভাঁর্গাদ প্রবণতার সাথে নিজেকে একাত্মকরণের একটি সচেতন প্রচেষ্টার উদাহরণ হিসেবেও সাঈদের নাটক

পাঠ করা যায়। একদিকে জটিল বিন্যাসে মনোনিবেশ করেছেন, অন্যদিকে জনগণের তাৎক্ষণিক আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে জনপ্রিয় প্যারাডাইমকেও মিলিয়ে দিতে ইচ্ছুক হয়ে উঠেছেন সাঈদ। বাঙালির রাষ্ট্রকল্পনা তাঁর নাটকের অভিমুখ হলেও একটা বিশ্বজনীন উদার মানবতাবাদের দিকেই চূড়ান্ত যাত্রা। সাঈদ একটি নাট্যভাষা নির্মাণে প্রয়াসী ছিলেন। শিল্পের মাধ্যমে সৌন্দর্যশাসিত এক জীবনের রূপায়ণে ব্রতী সাঈদ আহমদের নাটক একটি দেশীয় সিদ্ধি অর্জন করেছে। নাটকের কালাতীত দাবি পূরণের প্রশ্নেই আমি সাঈদের নাটক পাঠে মনোযোগী ও আগ্রহী। সাঈদ আকর্ষণীয় কারণ সাঈদ একটি নিরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। শিল্পের ভাষা যে স্থবিরতায় নয়, গতিপ্রবণতায়; ঐতিহ্যের অন্ধ অনুকরণ নয় বরং ভবিষ্যৎমুখী শিল্পের প্রয়োজনে নব্য কল্পনাকুশলতায় সৃজনের বিস্ফার–এমন এক দৃষ্টান্তের মেটাফরও সাঈদ আহমদের নাট্যভাষা। অ্যাবসার্ড রূপকল্প নিয়ে দূরগামী এই নাট্যভাষায় জাতীয়তাবোধের পাশাপাশি সাঈদ আত্মস্থ করেছেন বিশ্ববোধ। *একদিন প্রতিদিন* নাটকের অন্তিমে মুক্তিযোদ্ধা রফিকের সংলাপ যেন নাট্যকার সাঈদ আহমদের সেই জীবন-বীক্ষণেরই নিবিড় ভাষ্য : "আজকের এই মহান রাত কোথায় যে নিয়ে যাবে, কোথায় যে শেষ হবে কে জানে? অতীতের চোখে চোখ রেখে কথা বলার বুকের পাটা কী আমাদের আছে? আমাদের কাজকর্মের রোজনামচা যদি কোনো চারণ কবি গায় তবে সেই আসরে আমরা কী সসম্মানে বসতে পারব? আমরা স্বার্থান্ধ, নিষ্ঠুর। তবুও মাঝে মাঝে আসে আত্মোৎসর্গ ও অসামান্য সাফল্যের মহামুহূর্ত। অনেক অনেক মহৎ কাজের শক্তি আমাদের আছে। এদেশের মাটি তার সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু আমি–আমি, কী এই মহাশূন্য পরিক্রমায় একা? না, বোধহয় না,– হয়তো সঙ্গে আছে আরও অনেকে যাদের দরদ আছে, যারা এই ধরিত্রীকে ভালোবাসে। আমার বন্ধু যারা এ-যুগের যাত্রী" (হাই ২০১২:১১৮)।

(বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে প্রয়াত নাট্যকারদের স্মরণে গৃহীত কর্মসূচি *স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ* শিরোনামের পাঁচদিনব্যাপী সেমিনারের সমাপনী দিন ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে স্টুডিও থিয়েটারে সাঈদ আহমদ বিষয়ক বক্তৃতারূপে এই প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়।)

গ্রন্থপঞ্জি

ইউজিন এয়োনেস্কো (১৯৯০)। *এয়োনেস্কোর দুটি নাটক*, সাঈদ আহমদ (অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

বালা, ভ. বিপ্লব (২০১৫)। *বাংলাদেশের নাগরিক থিয়েটার অনেকান্ত অবলোকন*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা

বেকেট, স্যামুয়েল (২০০৬)। *ওয়েটিং ফর গডো* কবীর চৌধুরী (অনূদিত), ফ্রেন্ডস বুক কর্নার, ঢাকা

হক, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী (সম্পা.) (২০০০) *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

হাই, হাসনাত আবদুল (সম্পা.) (২০১২) *সাঈদ আহমদ রচনাবলি* (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

Abrams, M. H. (2000). *A Glossary of Literary Terms*, Harcourt Asia pte ltd, Singapore:

Ahmed, Syed Jamil (2014). Designs of Living in the Contemporary Theatre of Bangladesh. in: Ashis Sengupta (Ed) *Mapping South Asia through Contemporary Theatre Essays on the Theatres of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal and Sri Lanka*, Palgrave Macmillan

Esslin, Martin (1985). *The Theatre of the Absurd*, Penguin Books, USA, UK

Macey, David (2000). *The Penguin Dictionary of Cirtical Theory*, Penguin Books, London

Oneonta (2016). https://www.oneonta.edu/faculty/farberas/arth/arth200/LiberalHumanism.html

Paniker, K. Ayyappa (2003). *Indian Narratology*, Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi

Siddiqui, Zillur Rahman (edt.) (2003). *Bangla Academy English-Bengali Dictionary*, Bangla Academy, Dhaka